২০০৪

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

আহ্‌মদী

বুলেটিন

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের তা'লীম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে)

১৫ আগষ্ট, ২০০৪ ঈসাব্দ

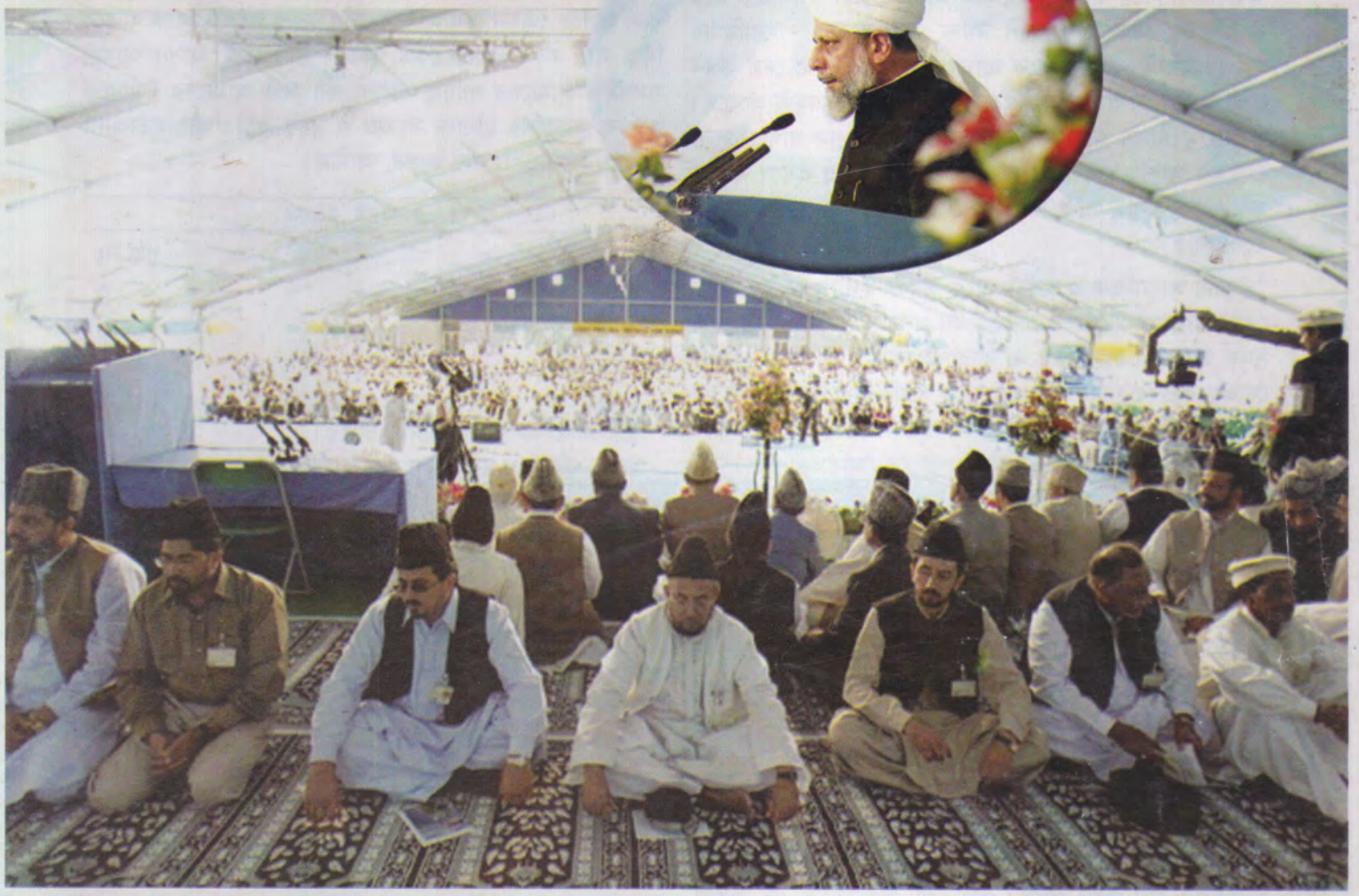

সম্পাদকীয়

আর্থিক কুরবানি ঈমানকে সুদৃঢ় করে

মালী বা আর্থিক কুরবানি সম্বন্ধে কোন আহমদীকে বেশি বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা আহমদী জামাতের বৈশিষ্ট্য যে, আহমদী জামাতের মাঝেই কেবল নেযামে খেলাফত ও সাথে সাথে নেযামে বায়তুল মাল রয়েছে। প্রত্যেক আহমদী এ বায়তুল মাল তথা খিলাফতের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক সামর্থানুযায়ী তার প্রিয় বস্তু অর্থাৎ ধন-সম্পদ থেকে রীতিমত কুরবানি করে থাকেন অর্থাৎ চাঁদা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক আহমদী এটা উপলব্ধিও করে থাকেন যে, আর্থিক কুরবানি ঈমান পরখের এক ব্যারোমিটার স্বরূপ। যখনই ব্যক্তির মাঝে জামাতে দূর্বলতা দেখা দেয় তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আর্থিক কুরবানির মান নিম্নমুখী হয়েছে। সুতরাং মু'মিনের আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও মান সমুন্নত রাখার জন্যে রীতিমত আর্থিক কুরবানির সবিশেষ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ

"পুনরায় আধ্যাত্মিক এ ব্যয়ের এ-ও একটি কল্যাণ যে, যে ব্যক্তি খোদাতাআলার উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে ধর্মে সুদৃঢ় হয়ে যেতে থাকে। এ কারণেই আমি আমার জামাতের লোকদেরকে বার বার বলি, যে ব্যক্তি ধর্মের দিক থেকে দূর্বল সে যদি অন্য পুণ্য কর্মে অংশ নিতে না পারে তার কাছ থেকে যেন অবশ্যই চাঁদা নেয়া হয়। কেননা, যখন সে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয় করবে তখন এতে তার ঈমানী শক্তি লাভ হবে আর তার সাহস ও বীরত্ব বাড়বে আর সে অন্যান্য পুণ্য কর্মেও অংশ নিতে শুরু করবে" (তফসীরে কবীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১২)।

অতএব যখনই কোন আহমদী নিজের মাঝে দূর্বলতা অনুভব করেন তখনই তার আত্ম-বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়ে দেখা আবশ্যক যে, মালী কুরবানিতে তার কোন প্রকার গাফিলতি তো হয়নি। অন্যদিকে জামাতের যারা কর্মকর্তা–বিশেষ করে আর্থিক কর্মকান্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, কোন আহমদী চাঁদা আদায়ে শিথিলতা দেখালে তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং চাঁদা আদায়ের জন্যে নসীহত করা। তার পক্ষে দোয়া করার জন্যে যুগ-খলীফার কাছে অনুরোধও করা যেতে পারে। মোটকথা, অর্থনৈতিক এই ব্যবস্থা প্রত্যেক আহমদীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানকে সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্যে যুগপৎ এক সংশোধনী ব্যবস্থা।

শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখায়। তাই মানুষ আল্লাহ্‌র পথে কুরবানি করতে সাহস হারিয়ে ফেলে। মানুষ গরীব হয়ে যাবে বা অভাব-অনটন রয়েছে তাই জামাতের চাঁদা দিতে কার্পণ্য করে। দারিদ্র দূরীকরণের এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভের জন্যে আর্থিক কুরবানী যে একটি মহৌষধ এ রহস্য অনেকেই বুঝতে চেষ্টা করেন না। বুযূর্গানে দ্বীন এ বিষয়ে সবিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাদের যখন অর্থাভাব হতো তখন তারা আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানি করতেন। আল্লাহ্‌তাআলা তখন তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) সহ অনেক বুযূর্গের ঘটনা আমাদের জানা আছে। অতএব চাঁদা দেয়ার মাঝে ধনী হওয়ার যে একটা গুরু রহস্য নিহিত রয়েছে তা-ও আমাদের সকলের বুঝা উচিত।

আল্লাহ্‌র জামাতের প্রয়োজন আল্লাহ্ অবশ্যই মিটাবেন। জামাতের কেউই যদি চাঁদা না দেন তাহলেও এ জামাতের কাজ বন্ধ হবে না। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, এ যুগে আমাদের ধন-সম্পদকে কল্যাণমন্ডিত করার জন্যে এ আর্থিক কুরবানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন দিন আসবে, দান করার অনেক লোক থাকবে কিন্তু দান গ্রহণ করার কেউ থাকবে না। তাই আসুন আমরা সময়মত আমাদের দায়িত্ব পালন করি আর আমাদের ঈমানকে আর্থিক কুরবানির মাধ্যমে সতেজ ও সুদৃঢ় করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

❐ ১৫ আগষ্ট, ২০০৪

বিষয় - সূচী পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদীস শরীফ ৩
- অমৃতবাণী ৩
- জুমুআর খুতবা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) ৪-৯
- জুমুআর খুতবা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত মানবতার সেবায় বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার উত্তম নমুনা সৃষ্টি করেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) ১০-১৬
- ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান ও সত্য হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ১৭
- পবিত্র নবী-সহধর্মনীগণ (রাঃ) মূল ঃ মোকাররম হাদী আলী চৌধুরী সাহেব ১৮-১৯
- হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবাদের মর্যাদা ২০
- ওয়াকফে নও সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা ২১
- আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ডাঃ আহমদ আলী ২২
- সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এই কবর স্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে ২৩
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রতিবেদন ২৪-২৫
- বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ঐশী নেতৃত্ব এবং আনুগত্যশীল ইলাহী জামাতের কোন বিকল্প নেই ২৬-২৭
- ওয়াকফে জাদীদ ঃ তালীম তরবিয়তের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীক ২৮-৩০
- সংবাদ ৩১

প্রচ্ছদ ঃ যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৮তম সালানা জলসার দৃশ্যাবলী
ইন্টারনেট থেকে হাফিয়া তাজরিয়ান-এর সৌজন্যে

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ আন্‌ফাল- ৮

৭৫। এবং যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, এরাই প্রকৃত মু'মিন; এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক।

৭৬। এবং যারা পরে ঈমান আনে, হিজরত করে এবং তোমাদের সাথে মিলে (আল্লাহ্‌র পথে) জেহাদ করে, এরাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; আর রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের[১১৪৯] মাঝে আল্লাহ্‌র বিধান একজনের চেয়ে আর একজন বেশি নিকটের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত।

১১৪৯। যেহেতু ৭৩ আয়াতে সকল মুসলমানকে একে অপরের ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নবী করীম (সঃ) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে এক প্রকার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অতএব পরস্পরের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারতো যে, তারা একে অন্যের সম্পত্তিতে অংশীদার। সুতরাং এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেবলমাত্র রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং অন্যান্য মুসলমান শুধু ঈমানের ক্ষেত্রে ভাই ভাই কিন্তু উত্তরাধিকারী হবে না।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা

কুরআন ঃ

"...তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতেও দূরে থাক" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)।

হাদীস ঃ

আন আবি বাকারাতা (রাঃ) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আলা উনাব্বিউকুম বে আক বারেল কাবায়েরে সালাসান ক্বালূ বালা ইয়া রাসূলাল্লাহে-ক্বালা আল ইশরাকু বিল্লাহে ওয়া উকুকুল ওয়ালেদায়নে ওয়া জালাসা ওয়া কানা মুত্তাকেয়ান ফাক্বালা আলা ওয়া ক্বাওলাযযূরে ফামাযালা ইউকাররেরুহা হাত্তা কূলনা লায়তাহু সাকাতা (বুখারী)।

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করব? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন, তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সঃ) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি (সঃ) সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা হতে বাঁচো। তিনি (সঃ) একথাটি পুন পুন উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম হায়! যদি তিনি (সঃ) চুপ করে যেতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদিগকে জানাচ্ছে যে, মূর্তি পূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্। এগুলো মানুষকে খোদা হতে দূরে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বলছেন অংশীবাদিতা পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। এগুলো মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে দেয়। এবং এগুলোর মধ্যে মিথ্যা হলো জঘন্যতম, যা মানুষের অন্তরকে কলুষিত করার সাথে সাথে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং পরিণামে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন, "বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না,-ইহা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানে না যে, খোদার আশীষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মাবূদ মনে করে। এজন্যে আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকে বর্ণনা করেছেন"।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

অমৃতবাণী

নবদীক্ষিতদের প্রতি চাঁদা সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কড়া নির্দেশ ঃ

"ইদানিং শত শত লোক বয়আত (দীক্ষা গ্রহণ) করছে কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা যায়, তাদের মাঝে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প যারা রীতিমত মাসে মাসে চাঁদা দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজের শক্তি-সামর্থ অনুসারে কয়েক পয়সা চাঁদা দিয়ে এ সিলসিলাহ্‌র সাহায্য করে না তার নিকট আর কি আশা করা যায়? এবং তাদের দ্বারা এ সিলসিলার কি উপকার হয়? একজন সাধারণ মানুষও যার অবস্থা অতি শোচনীয়, বাজারে গেলে নিজের জন্য এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য কিছু না কিছু এনে থাকে। সুতরাং মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্‌তাআলার এ সিলসিলাহ্ কি কয়েক পয়সার ত্যাগও পেতে পারে না? পৃথিবীতে কি এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে; পার্থিব হোক বা ধর্মীয় যা অর্থ ব্যতীত চলতে পারে? যেহেতু এ পৃথিবী কার্য-কারণ পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক পার্থিব কার্যই কোন না কোন কারণেই চালু থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তি কীরূপ কৃপণ ও নিস্তেজ, যে এরূপ মহান উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যে কয়েকটি পয়সার মত সাধারণ বস্তুও ব্যয় করতে পারে না? এরূপ একদিন ছিল যখন ধর্মের জন্য মানুষ ভেড়া-ছাগলের মত নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অর্থের কথা কি বলব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একাধিকবার নিজের বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন, এমন কি তিনি একটি সূঁচ পর্যন্ত বাকী রাখেন নি। এরূপে হযরত উমর (রাঃ) নিজের সামর্থ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি

(অবশিষ্টাংশ ১৯-এর পাতায় দেখুন)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত তেলাওয়াত করে হুযূর খুতবা প্রদান করেন।

অনুবাদ ঃ "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও"।

আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে বহু দূরে সরে গেছে বিপথগামী পথভ্রষ্ট এমন মানবজাতিকে সৎপথ দেখাবার জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নবীগণ আবির্ভূত হন যেন মানুষকে আবার আল্লাহ্‌র কাছাকাছি এনে দিতে পারে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সৎপথ বা সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব না। তাই আল্লাহ্‌র সব নবীগণ সত্যের শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং বড় সাহসের সাথে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে মানুষকে এক খোদাতাআলার প্রতি আহ্বান করে গেছেন। এরপর আল্লাহ্‌তাআলা যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখন ধর্মকে পূর্ণতা দানের সময় এসেছে, মানব জাতি এখন বলিষ্ঠ হয়েছে, তখন সত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হযরত মুহাম্মদ খাতামুল আম্বীয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠালেন। যিনি এসে ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়ে আমাদেরকে সত্যের উপর শক্তভাবে দাঁড়াতে এবং সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে, সত্যের উপর আমল করতে নসিহত করলেন। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, হে মোমেনরা! তোমরা ঈমান এনেছ অতএব, এখন ঈমানকে শক্তিশালী করতে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, সব সময় আমাদের অন্তরে যেন আল্লাহ্‌র ভয় থাকে এবং সব সময় তোমরা সকলকে সত্যের প্রতি আহ্বান কর; সত্যকে বাস্তবায়ন কর, সত্যবাদী হও এবং এর জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় এই যে, সত্যবাদীদের সঙ্গী হও, সৎ-সঙ্গ অর্জন কর, আজ পৃথিবীতে আঁ-হযরত (সঃ)-এর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কেউ নাই। আঁ-হযরত অত্যন্ত গভীরে গিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন, সততার ও ন্যায়ের শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, তোমরা হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) এর সাথে নিজেদের সংযুক্ত কর; তাঁকে (সঃ) জড়িয়ে ধর। তাঁর শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবনকে আলোকিত কর যে শিক্ষা তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের জন্য লাভ করেছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন। আমরা আহমদীরা আরো বেশি ভাগ্যবান এবং এজন্য আমরা যত বেশি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তত কম হবে। আমরা যত বেশি তাঁর প্রশংসার স্তুতি গাই যথেষ্ট হবে না এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে বর্তমান যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীকে মেনে নেয়ার সৌভাগ্য করে দিয়েছেন। যিনি আঁ-হযরত (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন। ইনি আমাদের জন্য আঁ-হযরত (সঃ) এর সুন্দরতম শিক্ষাসমূহ বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন। আঁ-হযরত (সঃ) এর শিক্ষাকে বুঝবার জন্য নসিহত করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, কুরআন মজিদে যেভাবে সত্য ও সততার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এমন আর কোন কিতাবে দেয়া হয়নি।

তিনি বলেছেন –"সত্য ও ন্যায়ের জন্য কুরআন শরীফে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, আমি কল্পনাও করতে পারি না যে, ইঞ্জিলে এর দশভাগের এক ভাগও থাকতে পারে"। তিনি খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে, তোমরা ইঞ্জিল খুলে দেখাও. কুরআন শরীফে যেভাবে সত্য ও ন্যায়ের জন্য জোরালো আবেদন আছে সেভাবে ইঞ্জিলেও আছে। যদি দেখাতে পার তাহলে আমি তোমাদেরকে অনেক বড় পরিমাণ অর্থ পুরষ্কার স্বরূপ প্রদান করব।

হযরত (আঃ) আরো বলেছেন– "কুরআন শরীফে মিথ্যা কথা বলা ও অসত্য বক্তব্য দেয়াকে প্রতিমা পূজার সমতূল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা থেকেও দূরে থাক" [সূরাতুল হাজ্জ ঃ ৩১]।

অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও যদি (তোমাদের সাক্ষ্য) নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়" (সূরা আন নিসা ঃ ১৩৬)।

এত বেশি তাগিদ, এত অধিক গুরুত্ব যেখানে দেয়া হয়েছে সেখানে আমাদের কর্তব্য কি? আমরা নিজেদের চরিত্রের মধ্যে সত্যকে কতটা বাস্তবায়িত করব? আমাদের আপাদমস্তক সত্যের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক কথায় সত্য উচ্চারিত হওয়া উচিত।

এবার আঁ-হযরত (সঃ) এর হাদীসের কিছু উল্লেখ করছি। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি তা বলব? আমরা আরয করলাম জী হুযূর! অবশ্যই বলুন। আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক (সমতুল্য অংশীদার) করা [সবচেয়ে বড় পাপের মধ্যে অন্যতম], পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, আঁ-হযরত (সঃ) কিছুর সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, প্রচন্ড আবেগের সাথে সোজা হয়ে বসে বড় জোর দিয়ে বলতে থাকলেন, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া অনেক বড় গুনাহ্। আঁ-হযরত (সঃ) এ কথা এতবার বললেন যে, আমরা মনে মনে চাচ্ছিলাম হুযূর (সঃ) যেন চুপ হন [কারণ হুযূর (সঃ) কষ্ট পাচ্ছিলেন]" (বুখারী; কিতাবুল আদব)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, আঁ-হযরত (সঃ) মিথ্যাকে কতটা ঘৃণা করতেন। আঁ-হযরত (সঃ) যা শিক্ষা দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র আদেশে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "শিরক এবং মিথ্যা দুটো একই জিনিস। মানুষজন নিজেদের মধ্যে অনেক প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে এবং অনেক মিথ্যার প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন– "আজ পৃথিবীর অবস্থা অতি শোচনীয়। যেদিক

থেকেই দেখ, সর্বত্র মিথ্যা সাক্ষী সাজানো ও বানানো হয়ে থাকে। মিথ্যা মামলা বানানো তো কোন ব্যাপারই নয়। মিথ্যা সনদপত্র বানানো হয়ে থাকে। [তথা কাগজপত্র মিথ্যা/জাল বানানো হয়, মিথ্যা মামলা করা হয়,সাক্ষী মিথ্যা বানানো হয়, আদালতে মিথ্যা উপস্থিতিও দেখানো হয়, মোটকথা সবকিছুই মিথ্যা] কোন ঘটনা বলতে গেলে সত্যকে উপেক্ষা করে বলে থাকে। এখন যদি এদের জিজ্ঞাসা করা হয় (যারা আমাদের জামাতের প্রয়োজনবোধ করে না) যে, সেটা কি এমন দ্বীন ছিল? সে দ্বীন (ধর্ম) কি এমনই ছিল যা আঁ - হযরত (সঃ) এনেছিলেন? আল্লাহ্‌তাআলা তো মিথ্যাকে অপবিত্র বলেছেন, এর থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। "তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা থেকেও দূরে থাক," (সূরাতুল হজ্জ ঃ ৩১)। এখানে প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাকে একত্রে রেখেছেন। মানুষ যেমন মূর্খতাবশত আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পাথরের প্রতিমার প্রতি ঝুঁকে যায় তেমনই নিজের স্বার্থের খাতিরে সত্যকে বিসর্জন দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিমা বানায়। এজন্যই আল্লাহ্‌তাআলা মিথ্যাকে প্রতিমা পূজার সাথে একত্রিত করেছেন। প্রতিমা পূজারী প্রতিমার কাছে ত্রাণ বা মুক্তি ভিক্ষা চায়। [সে মনে করে যে প্রতিমা তাকে মুক্তি দেবে] অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদী মিথ্যাকে প্রতিমা মনে করে যে এর মাধ্যমে সে মুক্তি লাভ করবে। এ কি রকম দূরবস্থা এসে পড়েছে? যদি বলা হয় যে, কেন প্রতিমা পূজা করছ? একে পরিত্যাগ কর! উত্তরে বলবে, কি করে ছাড়ব? এ ছাড়া যে আমাদের চলবে না! এর চেয়ে বেশি দূর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, মিথ্যাকে তারা নিজেদের ভিত বা শিকড় মনে করে। কিন্তু আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অবশেষে সত্যই সাফল্যমন্ডিত হয় এবং সত্যেরই বিজয় হয়" [মলফুযাত; ৮ম খন্ড; ৩৪৯ পৃঃ]।

তারা মনে করে যে, তাদের অন্তরে যে প্রতিমাকে তারা বসিয়ে রেখেছে–এর সাহায্যে তারা মুক্তি পাবে। এ প্রতিমাও অনেক প্রকারের আছে। বিভিন্ন দেশের মানুষজন বিভিন্ন প্রকার প্রতিমা নিজেদের অন্তরে বসিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন রকম পেশাজীবিদের মধ্যে সত্যের অভাব এবং মিথ্যার আধিক্য দেখা যায়। এরা তো সেই ধরণেরই প্রতিমা যাদের তারা নিজেদের অন্তরে স্থান দিয়ে রেখেছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা বলে যে, [যেমন হুযূর (আঃ) ও বলেছেন] এ ছাড়া কোন কাজই হয় না, যদি মিথ্যা না বলা হয়। যেমন উকালতি (আইন ব্যবসা) বড়ই সম্মানজনক পেশা যদি ঠিকমত এটাকে গ্রহণ করা হয়। কাজে লাগানো হয়। কিন্তু কোন কোন উকিল সাহেবের স্বভাব এরকম যে, তারা একটি সোজা সহজ মামলাকেও এমনভাবে সাজাবেন যে, তার মধ্যে মিথ্যা মিশিয়ে দিবেন এবং পরবর্তীতে মক্কেলের ক্ষতি হয়ে যাবে। এখানে ইউরোপীয় দেশগুলোতে আহমদীরাও এসেছে। এসাইলমের কেস্ (এসব দেশে থাকার অনুমতি চেয়ে) অনেক সময় খুব সহজ সোজা হয়। যদি সহজভাবেই কেস্ সাজানো হয় তাহলে হয়ত সহজভাবেই সমাধানও হয়ে যেত। কিন্তু অযথা কিছু কথা কেসের অন্তর্ভুক্ত করাতে অনেক সময় ভাল ভাল কেস্ খারাপ হয়ে যায়। আবার অনেক সময় উকিল তার মক্কেলের সাথে ঠিকভাবে কথাই বলেন না। সঠিক অবস্থা খুলে বলেন না। বহুদিন পরে খোঁজ করে দেখা যায় যে, উকিল সাহেব ঠিকমত কেস্‌কে চালাচ্ছেনই না। অনুরূপভাবে আমাদের দেশগুলোতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, উকিলেরা অশিক্ষিত লোকজনকে চক্কর বা ঘুরপাক দিতে থাকেন। আদালতে কেস্ পেশ হচ্ছে না কিন্তু তাদের টাকা নিয়ে চলেছেন। অপরদিকে অপরাধীকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দেয়ানো হচ্ছে। যাদের থেকে ফী এর টাকা নেয়া হচ্ছে তাদেরকে মিথ্যা বলে বলে গড়িমসি করা হয়ে থাকে। এসব অনেক বিষয় আছে। তাদের মতে এ ধরণের কথা যেন বলা হয়। যেমন এমন উকিলরা যদি এ ধরণের ধোঁকাবাজি না করে, মানুষজনকে ধোঁকা না দেয় তাহলে তাদের আয় থাকবে না, রিয্‌ক থাকবে না। যদি খুব সহজে কেস্ (মামলা) এর নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাহলে উকিলদের আয় থাকবে না। তাহলে ঘটনা এই দাঁড়াল যে, মিথ্যা কথা বা অসত্য কথা বলা তাদের রাযেক বা রিয্‌ক দাতা হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'তোমাদের রিয্‌ক দাতা আমি'। উকিল সাহেবদের ওসব আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। একটি উদাহরণ আমার মনে পড়ে গেল। আমরা তখন ফয়সালাবাদে ছিলাম। খোদ্দামের টিম খেদমতে খালক প্রোগ্রামে মাঝে মাঝে বাইরে যেত। তারা গ্রামে গিয়ে মানুষজনের সাথে দেখা করত। তাদের কি ধরণের সহযোগিতা করা যায়, কিভাবে তাদের কোন উপকার করা যায়। কৃষকদের কিভাবে সাহায্য করা যায় ইত্যাদি। একবার আমরা এক গ্রামে গিয়েছিলাম। একজন গ্রামবাসী বলেছিল। কথায় কথায় সে জেনে গেল যে, আমরা আহমদী। যতক্ষণ মানুষ জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে না নিত সাধারণত আহমদীয়তের কথা প্রচার করতাম না। আমি তাকে বললাম, ফয়সালাবাদে একজন আহমদী উকিল শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব আছেন তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি বড়ই পুণ্যবান, খাঁটি মানুষ; কখনই তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। মিথ্যা মামলা তিনি গ্রহণই করেন না। ঐ ব্যক্তি পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন, তাঁর মধ্যে একটি বড় দোষ আছে যে, তিনি মির্যায়ী (কাদিয়ানী)। এখানে দেখেন যে, তাঁর মধ্যে দোষ বলতে একটি মাত্র দোষ যে তিনি মির্যায়ী বা আহমদী। অন্য কোন দোষ নাই। এটা তো তার নির্বুদ্ধিতা, বেচারা নিজেরা জানেনা। মৌলভীরা যা বলে রেখেছে তাই সে বলল। এ ক্ষেত্রে আবূ জাহ্‌লের কথা মনে পড়ে গেল, সে আঁ-হযরত (সঃ) সম্পর্কে বলেছিল ঃ "ইন্না লা নুকায্‌যিবুকা, বাল্ নুকায্‌যিবু বিমা জিতা বিহি", আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না তুমি সত্যবাদী, নিঃসন্দেহে তুমি সত্য বল,কিন্তু তুমি যা এনেছ, যে শিক্ষা দিতে চাও আমরা তা অস্বীকার করছি" (তিরমিযী কিতাবুত তফসীর)।

আজ বর্তমান যুগে আঁ-হযরত (সঃ) এর প্রকৃত সুন্নতের উপর আমল করছে, তাঁরই (সঃ) প্রকৃত অনুসারী যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতে যারা শামিল হয়েছে। এরা আঁ-হযরত (সঃ) এর শিক্ষা অনুসারে নমুনা দেখাচ্ছে, আপনারা সাবধান, কেউ যেন মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিতে না পারে। হ্যাঁ এ জামাতের মূল শিক্ষাকে মানুষ মিথ্যা বলছে– এটা তো অস্বীকারকারীদের পুরানো রীতি।

তারপর এমন ডাক্তার দেখবেন যারা মিথ্যা মেডিকেল রিপোর্ট বানিয়ে দেন। অনেক সময় মিথ্যা মামলাও বানিয়ে দেন। যেকোন পেশাজীবি যখন খেয়ানত করে (কর্তব্যের বা ক্ষমতার অপব্যবহার) তখন সে মিথ্যাকে গ্রহণ করেই তা করে। খেয়ানত মিথ্যা ছাড়া আর কি?

তারপর শিক্ষকগণ। কোন কোন শিক্ষক নিজের এত বড় মর্যাদাপূর্ণ পেশার (অমর্যাদা করছে) মিথ্যার কারণে বদনাম করছেন। ঘুষ বা উৎকোচের টাকা নিয়ে মিছামিছি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে তো জাল সনদও নিয়ে এসে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেছেন। কোন কোন দেশে তো তাদের ঐ যোগ্যতার কোনই মূল্য নাই। আজকালকার সমাজ জীবনে এত বড় বড় ভয়ানক অপরাধ চলছে। পাকিস্তানসহ অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এসব কথা তো গোপন নয়। এসব কথা দৈনিক খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। যখন সমাজে মিথ্যা এভাবে প্রসার ও বিস্তার লাভ করে তখন চারিত্রিক মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। এক সময় পুরো সমাজ এমন হয়ে যায় যে, তারা তখন অনুভবও করে না যে, কি হয়ে গেছে, আল্লাহ্‌তাআলা থেকে তারা কত দূরে চলে গেছে! প্রত্যেক আহমদীর উচিত এমন সমাজ থেকেও যেন নিজেকে রক্ষা করে। তাদের সকলের মধ্যে চেতনা ও কর্তব্যবোধ যেন কাজ করে; নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সন্তানদের মধ্যেও যেন এ অনুভূতি সৃষ্টি করা হয় যে, তুমি একজন আহমদী, তোমাকে সত্যের উপর দাঁড়াতেই হবে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ করতেই হবে। যত ক্ষতি হয় হোক, কোন চিন্তা নাই। প্রত্যেক আহমদী তা সে চাকুরীজীবি হোক, ব্যবসায়ী হোক বা যেকোন পেশায় নিয়োজিত হোক, তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমি মিথ্যাকে কখনই অবলম্বন করব না। ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় মালপত্র বিক্রি করতে গিয়ে অসত্য কথা বলে, মিথ্যা কথা বলে। সাময়িকভাবে তারা হয়ত লাভ দেখে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা মিথ্যার পথে পা বাড়িয়ে শিরকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বর্তমানকালে একজন আহমদীকে বারবার ফুঁ দিয়ে দিয়ে পা আগে ফেলতে হবে। কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর হাতে বয়আত করে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের প্রতিজ্ঞা করার পর অসাবধানতার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আমরা ধরে নিয়েছি যে, মিথ্যা বলে সম্ভবত খোদাতাআলাকে ধোঁকা দিতে পারব। [নাউযু বিল্লাহ্ (আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)] এটা বড়ই ভয়ের ব্যাপার, খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক]।

হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ-হযরত (সঃ) বলেছিলেন, আমার খুব স্মরণ আছে যে, যে কথার মধ্যে সন্দেহ আছে তা ছেড়ে দাও। সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিত কথাকে ধারণ কর। কারণ এমন সত্য যা নিশ্চিয়তা দান করে তা তৃপ্তিও দান করে। মিথ্যা অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে" (বুখারী কিতাবুল বুয়ূতা)।

অনেক সময় মানুষ বলে যে আমি তো মিথ্যা কথা বলি নাই। অথচ এত অস্পষ্ট ও মিশ্রিত কথাবার্তা বলে যে আসলে মিথ্যা কথাই হয়। এ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, সুস্পষ্ট কথা বল, নির্জলা সত্য কথা বল। সন্দেহমূলক কথাবার্তা বলবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, কারো অন্তরে ঈমান ও কুফরী একত্রিত হতে পারে না এবং সত্য ও মিথ্যা কথা একত্রে থাকতে পারে না। এবং আমানত ও খেয়ানত একত্রিত হতে পারে না" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড; পৃঃ ৩৪৯)।

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর রেওয়ায়াত উল্লেখ আছে। আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ 'একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই অন্যদেরকে বলে দেয়' (মুসলিম, বাব নেহি আনেল হাদীস বিকুল্লিমা সায়মেয়া)।

অনেক মানুষের অভ্যাস আছে যা ইচ্ছা বলে বেড়ায় এবং আনন্দবোধ করে। এক কথা এদিকে বলে গেল, আর এদিকের কথা সেদিকে গিয়ে বলে দিল। আলোচ্য হাদীসের আলোকে আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার। এমন তো নয় যে, আমরা অজ্ঞাতসারে অথবা জেনে শুনে নিজের উপর মিথ্যাবাদী হওয়ার লেবেল সেঁটে দিচ্ছি!

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ [এ কথাটি পিতামাতার জন্য খুবই উপযোগী কথা] 'কেউ যদি কোন ছোট শিশুকে বলে যে, 'এস, তোমাকে আমি কিছু দিব'। তারপর সে তাকে তা দিল না। এটা মিথ্যা হবে' (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা)।

এর অর্থ এই যে, এভাবে শিশুর মধ্যে সত্য ও মিথ্যার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার তরবিয়তের জন্য এটি খুবই জরুরী বিষয়। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়ত করতে হবে এবং আমাদের উপরে একটি বড় দায়িত্ব আছে, প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে আমাদের অনেক ওয়াকফীনে নও শিশুরা আছে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাদের তরবিয়ত করতে হবে এবং আহমদী পরিবেশেও তাদের তরবিয়ত করতে হবে। শিশুকাল থেকেই তাদের অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি মোহ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য সবসময় সবাইকে খুব সাবধান থাকতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) একদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আমার মা আমাকে ডাকলেন যে, এস আমি কিছু দেব। আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমি তাকে কি দিতে চাও। মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, তুমি যদি তাকে না দিতে তাহলে তোমার নামে মিথ্যা লেখা হত" (আবু দাউদ)। দেখুন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হযরত ফাতেমা (রাযি আল্লাহু আনহা) হযরত আসমা (রাঃ) এর কাছ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, "একজন মহিলা আঁ-হযরত (সঃ) এর কাছে জানতে চেয়েছিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমি যদি আমার সতীনকে মিছামিছি বলি যে স্বামী আমাকে একটি জিনিস দিয়েছে অথচ স্বামী তা দেননি। (তাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেবার জন্য যদি এমন কথা বলি) তাহলে কি আমার পাপ হবে? আঁ- হযরত (সঃ) বললেন, 'যদি কেউ কোন জিনিস না পেয়েও বলে যে আমি পেয়েছি তাহলে এমন ধরে নিতে হবে যে, সে মিথ্যা পোশাক পরে আছে" (মুসলিম কিতাবুয্ যিনা)।

এটা তো আসলেই মিথ্যা। এ সমাজে অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলকভাবে মিথ্যা কথা বলা হয়। অনেক সময় কাউকে হেয় করার জন্যও এমন কথা প্রচার করে দেয়া হয় যে, আমাদের (বস্) স্যারের সাথে আমার খুব ভাল সম্পর্ক। শুধু শুধু অন্য একজনকে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালানোর জন্য এমন করা হয়। আবার আত্মীয়দের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও এ ধরণের কথাবার্তা প্রচার করে দেয়া হয়। অযথা পরস্পরের সম্পর্ক খারাপ করার জন্য এ

ধরণের মিথ্যা কথা প্রচার করা হয়। এ ধরণের সমস্ত কথাই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, চারটি কথা এমন যে এসব কথা কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি পাওয়া যায় তাহলে সে পুরোপুরি মুনাফেক। যে ব্যক্তির মধ্যে একটি কথা আছে তার মধ্যে মুনাফেকীর এক অংশ আছে। যতদিন সে ঐ কথাটি পরিত্যাগ না করে (বাকীদের সম্পর্কে কি বলা যায়?)। প্রথম কথাটি এই যে, সে যখন কথা বলে, সে মিথ্যা কথা বলে। (অর্থাৎ তার কথার মধ্যে মিথ্যা কথা প্রকাশ হয়।) দ্বিতীয় কথা এই যে, সে কোন চুক্তি করলে চুক্তি ভঙ্গ করে। তৃতীয় কথা এই যে, সে কোন ওয়াদা (প্রতিজ্ঞা) করলে নিজের ওয়াদা রক্ষা করে না। চতুর্থ কথা এই যে, সে ঝগড়া করার সময় গালিগালাজ করে" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

উপরোক্ত হাদীসের কথাগুলো যদি বিশ্লেষণ করেন তবে দেখবেন যে, সমস্ত কথাগুলোই মিথ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম কথাটি তো স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস। অনেক মানুষ খুলাখুলি মিথ্যা কথা না বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। আবার এমনও হয়, এমন কথা বলা হয় যে, ঐ কথার যেকোন অর্থ ধরে নেয়া যায়। অনেক সময় এমন অস্পষ্ট কথা বলা হয় যার ফলে মানুষের মনে ফাটল ধরে যায়। মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। জামাতের নেযামের পক্ষ থেকে অথবা তাদের কোন আত্মীয়-স্বজনদের কেউ তদন্ত করে–তখন দেখা যায় যে, মূল কথাই সঠিক ছিল না। কথা তো এমন ছিল না যা একজনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তুমি এমন কথা বলেছ যদ্বারা দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, লড়াই হয়েছে। তখন সে ভাবলেশহীনভাবে উত্তর দেয় যে, আমি এমন করে কথা বলেছিলাম না। আমার কথার অর্থ তো এ রকম ছিল। এসব লোকেরা তখন খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। অথচ সে কেবল মজা করার জন্য এমন কথা বলেছিল। 'বি জামালো'-র চরিত্রে অভিনয় করেছিল। প্রকাশ্য মিথ্যা বলেছে অথবা লুকানো মিথ্যা কথা বলেছে। আঁ-হযরত (সঃ) এদেরকে মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ মো'মেনের জন্য তো পরিস্কার ও সুস্পষ্ট সহজ ও সুদৃঢ় কথা বলার নির্দেশ রয়েছে (কুলু কাওলান সাদিদা)। এমন কথা বল– যা খুব পরিস্কার ও সুস্পষ্ট হয় যেন, সহজ কথা-সোজা কথা, সহজ বোধ্য যেন হয়, কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা না থাকে। সে কথার দ্বারা যেন মানুষের অন্তরে ফাটল সৃষ্টি না হয় তারপর মুনাফেক চরিত্রের দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে চুক্তি ভঙ্গের কথা। এমন লোক চুক্তি করে ঠিক, কিন্তু পরে তা রক্ষা করেনা–চুক্তি ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে। আঁ-হযরত (সঃ) কি করেছিলেন? বড়ই নির্যাতিত, বেহাল মুসলমানেরা বড়ই কষ্টে মক্কায় জীবন যাপন করতেন। আঁ-হযরত (সঃ) এর মদিনায় অবস্থানকালে মক্কার কাফেরদের সাথে চুক্তি হয়েছিল যে, মক্কার মানুষ যদি পালিয়ে মদিনায় চলে যায় আঁ-হযরত (সঃ) তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাবেন। বড়ই হৃদয়-বিদারক হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির শর্ত রক্ষার্থে আঁ-হযরত (সঃ) এমন লোকদের মক্কায় ফেরত পাঠিয়েছেন। এ ছিল আঁ-হযরত (সঃ) চরিত্র। আজকাল বড় বড় রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চুক্তি ভঙ্গ করা হয়। বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের বা অন্যান্য দরিদ্র রাষ্ট্রের সাথে কৃত চুক্তির অবস্থা তো জিজ্ঞেস করারও কেউ নেই। অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ–ইসলাম এমন, ইসলাম তেমন! যাহোক, তাদের কর্মফল তাদের সাথে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য নসিহত এই যে, তোমরা যদি চুক্তিভঙ্গ কর তাহলে তোমাদের ভেতরে মুনাফেকীর বীজ রয়েছে। এজন্য ভয় কর এবং নিজেদের দূর্বলতা দূর করতে চেষ্টা কর।

এবার পারিবারিক পরিসরে আত্মীয়তার বন্ধনের চুক্তির কথা উল্লেখ করছি। বিয়ে-শাদীর বিষয়টাও তো নারী-পুরুষের মধ্যে একটি চুক্তির বিষয়। নারীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে তার উপর কিছু দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। যেমন স্বামীর প্রয়োজন পূরণ করা, সন্তানদের লালন-পালন করা, ঘর গৃহস্থালী সক্রান্ত বিষয়াদী দেখাশোনা করা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে পুরুষদের কাঁধে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। উভয়ে মিলে সন্তানদের তরবিয়ত করবে। স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি আর্থিক বিষয় পুরুষদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। তাদের সবরকম প্রয়োজন পূরণ করা পুরুষের দায়িত্ব। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যত বেশি যত্নসহকারে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, একে অপরের অধিকার সংরক্ষণ করবে ততবেশি সুন্দর ও সফল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু অনেক সময় দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কিছু কিছু ঘটনা দেখে দুঃখ হয়। এখানে পশ্চিমা দেশে বা ইউরোপে অনেক সময় এমন হয় যে, আমাদের এখানকার কন্যা পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের কোন যুবককে স্পনসার করে এদেশে নিয়ে আসল। বিয়ে হল, হাসিখুশিভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল; দু'একজন সন্তানও এসে গেল। এ সময়ে ঐ যুবক বা পুরুষের এদেশে বসবাসের কাগজপত্রও প্রস্তুত হয়ে গেল। তাকে এদেশ থেকে আর যেতে হবে না। তারপর আস্তে আস্তে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার আরম্ভ করে দিল। এভাবে একটি সুন্দর সংসার পবিত্র সম্পর্কের চুক্তি ভঙ্গ হতে হতে পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, ছোট ছোট অজুহাত বা মিথ্যার উপর ভিত্তি করা কিছু কথা ছাড়া ভেতরে কোন বিষয় থাকে না। অযথা অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে। এমন লোকেরা তো মুনাফেকদের শ্রেণীভুক্তই বলতে হয়। আহমদীদের এ বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া উচিত।

তারপর তৃতীয় স্বভাব তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা। (ওয়াদা ভঙ্গ) এও এক ধরনের মিথ্যা। বর্তমান যুগে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দৃশ্য দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিজ্ঞা করার সময় থেকেই নিয়ত খারাপ থাকে এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে প্রমাণ হয়ে যায় যে, প্রথম থেকেই নিয়্যত খারাপ ছিল। কারণ আরম্ভকালেই সে চিন্তা করে যে, চল এখন প্রতিজ্ঞা করি এবং যা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় ভোগ করি। তারপর দেখা যাবে। এখন মিথ্যা হলে হোক তাতে কি যায় আসে। যখন প্রতিজ্ঞা পালনের সময় তখন দেখা যাবে। তখন অগ্রাহ্য করব কোন মিথ্যা কথা বলে দিলেই হবে। এমন লোকদের বিচার হওয়া উচিত। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকে সে সামান্য ব্যাপার ভাবছে। অথচ এটা সামান্য ব্যাপার নয়। আঁ-হযরত (সঃ) এমন ব্যক্তিকে তো মুনাফেকদের সারিতে দাঁড় করিয়েছেন। মুনাফেকরা তো কাফেরদের চেয়েও বড় অপরাধী বা পাপী।

তারপর তাদের চতুর্থ স্বভাব এই যে, তারা যখন ঝগড়া করে তখন গালি-গালাজ করতে থাকে। আহমদীরা এ ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝেন। আপনারা দেখেছেন, বিরোধীরা কি রকম গালিগালাজ করে, কত খারাপ ভাষা বলে, মিথ্যা বলে। সত্যবাদীরা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কথা বলে, ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলে। মিথ্যাবাদীদের কাছে যেহেতু যুক্তি-প্রমাণ থাকে না–তাই মারধর গালি-গালাজ করে। এমন লোকেরাও আঁ-হযরত (সঃ) এর বর্ণনামতে মুনাফেকদের দলে পড়ে। যদি আরো বেশি খোঁজ-খবর কর তাহলে আরো অনেক মুনাফেকী কথা বের হতে থাকবে। এ তো গেল অন্যদের কথা।

তাদের কর্ম তাদের সাথে, তাদের ব্যাপার খোদার হাতে। তিনি নিজেই তাদের সাথে যা করণীয় তা করবেন। কিন্তু আহমদীদের সতর্ক হওয়া চাই। নিজেদের বিচার নিজেরা করা উচিত। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, ভাইদের মাঝে, আত্মীয়দের মাঝে, বংশের মাঝে, নিজেদের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে যায়। ঠিক বা ভুল সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু কোন পক্ষের জন্যই এটি শোভনীয় নয় যে, ঐ তিক্ততাটাকে এত বেশি বাড়তে দিবে যে গাল মন্দের পর্যায়ে চলে যাবে। আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি তিক্ততা সৃষ্টি হয় তাহলে তুমি আপোষ-রফার জন্য প্রথমে এগিয়ে যাও। আপোষের জন্য নিজের হাত প্রসারিত কর। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যুকদের মত নতি স্বীকার কর। গালমন্দ করে নিজেদের উপর মুনাফেকীর লেবেল না লাগিয়ে নতি স্বীকার করাটাই শ্রেয়। আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে এর থেকে রক্ষা করুন। গালাগালি সবসময়ই মিথ্যাবাদীর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ "তুমি নিজকে মিথ্যা বলা থেকে বাঁচাও। কারণ এটা আধ্যাত্মিক অবস্থানকে ধ্বংস করে দেয়ার মত ব্যাধি। আবার শিরক কিন্তু নিজেই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। কারণ খোদাতাআলা কাউকে ওসব ক্ষমতা প্রদান করেননি যাদের সম্পর্কে মুশরেকরা (অংশীদারবাদীরা) বলে যে, তাদের মধ্যে এমন এমন ক্ষমতা আছে। (তারা প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করে থাকে যাকে তারা পূজ্য বানিয়েছে। অর্থাৎ পূজারীরা মনে করে যে, তাদের পূজ্যদের মাঝে ওসব ক্ষমতা আছে)। এভাবে তারা মিথ্যা নামক আবর্জনার মধ্যে মুখ রাখে। প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ্র নবীগণের জামাতের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে, তারা ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে। এবং এমন একটি বৈশিষ্ট্য যে, এর নিজস্ব মূল্য অনেক বেশি। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে অনেক মানুষই এর মূল্য ও মর্যাদা বুঝে না। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এ ব্যাধি অনেক বেশি বিরাজমান। কারণ এ যুগ খোশামোদী ও মুনাফেকীর যুগ। আজ ভদ্রতার অর্থই এটা মনে করা হয়েছে যে, যার সাথে কথা বলা হয় তাকে এত বড় মর্যাদা দিতে হবে, তার পসন্দের প্রতি এত বেশি নজর দিতে হবে যে, কথা বলার সময় মনে রাখতে হবে যে, আপনার কথা যেন তার মনপূত হয়; প্রয়োজনে কিন্তু সত্য গোপন করতে হবে। কিন্তু আপনাদের প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে হবে যে দিনকাল যাই হোক, এ পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, পুরোশক্তিতে এর প্রতিরোধ করতে হবে, এটাকে পদদলিত করতেই হবে– তা যে কোন মূল্যেই হোক। কারণ মিথ্যা কথা যে বলে সে আসলে অপরজনকে ধোকা দিতে চেষ্টা করে এবং ধোকা এমন জিনিস যদ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং মিথ্যা কথা যে বলে সে কেবল নিজের চারিত্রিক দোষেই দোষী হয় না বরং সে মানবতার শত্রু; মানবতাকে ধ্বংসকারী ব্যক্তি। এমন অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রত্যেক খাঁটি মানুষদের জন্য ফরয। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম হচ্ছে এই যে, সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে। কুরআন করীমে বলা হয়েছে যে মুনাফেকদেরকে জাহান্নামের সবচেয়ে মন্দ স্থানে রাখা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা মুনাফেকদের সাথে কাফেরদের চেয়েও বেশি কঠোর ব্যবহার করবেন। কারণ কাফেরদের জন্য কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু মুনাফেকদের দ্বারা মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে থেকে মিথ্যাকে মিটাতে পারে না, কিন্তু আশা করে যে, তারা উন্নতি করবে–সম্মান লাভ করবে, তাদের এমন ধারণা বড় ভুল ধারণা। তাদের এ ধারণা এমন যেমন শিশুরা কল্পনা করে যে, তারা চাঁদে যাবে বা তারার কাছে পৌঁছে যাবে"।

তারপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) আরো বলেছেন ঃ "সত্য এমন এক জিনিস যাকে বাদ দিয়ে কোন জাতির মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ সৃষ্টি হয় না। যারা সত্যবাদিতা ও সততার নমুনা দেখাতে পারে তারা নিজের জাতির সম্মানকে উজ্জ্বল করতে পারে। যারা সত্যবাদিতার নমুনা প্রদর্শন করে না তারা নিজের জাতির গলা কেটে দেয়" (তফসীরে কবির; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১-৪৩ পৃষ্ঠা)।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন "সত্য ও ন্যায় বিচারকে কায়েম কর; তোমাদের সাক্ষ্য প্রদান আল্লাহ্র খাতিরে হওয়া চাই। মিথ্যা বলবে না যদি সত্য বলাতে তোমার প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও দেখা দেয় অথবা তোমার পিতামাতার জন্য বিপদ হয়, অথবা তোমার আত্মীয়-স্বজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও" (ইসলামী উসূল কি ফিলোসফী; পৃষ্ঠা ৫৩)।

তিনি (আঃ) আরো বলেছেন "সত্যের মধ্যে এক প্রকার সাহস ও দৃঢ়তা থাকে। মিথ্যুক ব্যক্তি ভীতচিত্ত হয়। সে– যার জীবন নাপাক, ময়লা ও পাপ লিপ্ত সে সবসময় ভয়ে ভীত থাকে, সে সাহস করে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে না। একজন সত্যবাদীর মত সাহসী ও শক্তিশালী হয়ে নিজের সত্যতাকে প্রকাশ করতে পারে না এবং নিজ চরিত্রের পবিত্রতাকে প্রমাণ করতে পারে না। জাগতিক বিষয়াদীর কথাই চিন্তা করে দেখ। কে এমন আছে যাকে খোদাতাআলা কিছু সন্তোষজনক সম্মানজনক অবস্থান দিয়েছেন, কিন্তু তার প্রতি কেউ হিংসা পরায়ণ নয়? প্রত্যেক ভাল অবস্থানে অবস্থানকারীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী অবশ্যই থাকবে। এবং সাথে লেগেই থাকবে। ঠিক এই একই অবস্থা ধর্মীয় বিষয়াদীতেও পরিলক্ষিত হয়। শয়তানও সংশোধনের শত্রু। অতএব, মানুষের নিজের হিসাব পরিস্কার রাখা কর্তব্য; খোদার সাথে সম্পর্ক যেন ঠিক রাখে। খোদাকে যেন সন্তুষ্ট রাখে। তারপর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন নাই। কারো পরোয়া (ভ্রুক্ষেপ) করতে হবে না। সে যেন এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যার কারণে আযাবে পতিত হবার সম্ভাবনা আছে।

তবে এসব কিছু–এর কোন কিছুই ঐশী অদৃশ্য শক্তির সমর্থন ব্যতীত সম্ভব নয়। একজন মানুষের কেবল নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না

যতক্ষণ তার সাথে খোদাতাআলার ফযল শামিল না হয়। "খুলিকাল ইনসানো যায়ীফা" (সূরাতুন নিসা, ২৯)। অর্থ ঃ মানুষ নিতান্তই দূর্বল; ভুল-ত্রুটিতে ভরা; বিপদাপদে চারিদিক থেকে ঘেরা সুতরাং দোয়া করা কর্তব্য যে, আল্লাহ্ যেন সৎকর্ম ও পুণ্য কর্মের শক্তি ও সুযোগ দান করেন, অদৃশ্য হাত যেন সমর্থন করে এবং তার ফযল ও রহমতের অধিকারী করে দেয়" (মলফুযাত; ৫ম খন্ড; ৫৪৩ পৃষ্ঠা)।

হযরত আকদস (আঃ) আরো বলেছেন, "সিদ্দীক প্রাচুর্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ সিদ্দীক সে– যে ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে ডুবে গেছে, সত্যবাদিতাকে চূড়ান্ত করে দিয়েছে, খাঁটি প্রেমিক হয়ে গেছে। এটি এমন একটি রূহানী মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান যেখানে গিয়ে মানুষ সকল প্রকার সত্যবাদিতার, সৎকর্মের ও ন্যায়পরায়ণতার সমষ্টি হয়ে যায় এবং এসবকে আকর্ষণকারী হয়ে যায়। যেমন সিদ্দীক সকল প্রকার সত্যের আধার বা আকর হয়ে যায়। ... সিদ্দিকীয়তের কামালাত (পূর্ণতাসমূহ) লাভের ফিলসফি বা দর্শন এই যে, যখন সে নিজের অপারগতা ও অক্ষমতাকে বুঝতে পারে তখন সে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে 'ইয়াকানাবুদু' বলতে থাকে এবং সত্যকে অবলম্বন করে ধারণ করে এবং মিথ্যাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে দেয় এবং প্রত্যেক প্রকার নাপাক, (অপরিস্কার) ময়লা, পঙ্কিলতা–মিথ্যার সাথে যার সম্পর্ক তার থেকে দৌড়ে দূরে সরে যায় এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, কখনই মিথ্যা বলব না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না; নিজ নফ্সের আবেগে কোন প্রকারেই মিথ্যা কথা বলব না, না অনর্থকভাবে, না মঙ্গল লাভের আশায় আর না দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে (কোন কারণে কোন অবস্থাতেই নয়)"।

অনেকের ধারণা এই যে, সময়ের আবর্তে সুযোগমত প্রয়োজনে কোন কোন সময় মিথ্যা কথা বলা জায়েয। অমুক মিথ্যা কথাটি বললে অমুক উপকার পাওয়া যেতে পারে। সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে, অথবা অমুক অমঙ্গল থেকে বাঁচার জন্য আমি এ অপকর্মটি করছি। অথবা এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মিথ্যা বলা জায়েয হয়ে পড়েছিল। হযরত (আঃ) বলেছেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা জায়েয হয় না, হবে না। বলেছেন যে, "প্রতিজ্ঞা কর যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলব না"। যখন কেউ এমন প্রতিজ্ঞা করে তখন সে ইয়াকানা নাবুদু-র উপর আমল করে। তারপর 'ইইয়াকা নাসতাইন'। মুখে বলার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং এর সম্পর্ক আমলের সাথে। খোদাতাআলা যিনি সকল কল্যাণের উৎস, সকল সত্যের সকল ন্যায় এর উৎস [যেখান থেকে আল্লাহ্র মা'রেফত এবং কল্যাণরাজি বের হচ্ছে; যিনি সত্য ও ন্যায়কে প্রদর্শন করেন] তিনি তখন অবশ্যই তার সাহায্য করবেন এবং তার জন্য সত্যের উচ্চ শিক্ষা সত্যের প্রতি উচ্চ তরিকা (পদ্ধতি) ও সত্যের প্রকৃত রহস্য তার জন্য উন্মুক্ত করবেন। যেমন এটা নিয়মের কথা বলে যে, যে ব্যবসায়ী ভাল নিয়ম মেনে চলে, ন্যায় ও সততাকে হাতছাড়া করে না সে যদি এক পয়সার ব্যবসাও করে আল্লাহ্ তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন"।

এভাবে একজন মানুষ সততা ও সত্যকে ভালবাসতে থাকে এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নেয় এবং জীবন যাপন করতে থাকে। একদিন দেখা যায় যে, তার ঐ ন্যায়পরায়ণতা তার জন্য মহামহিমান্বিত সত্যকে ডেকে আনে যদ্বারা সে একদিন খোদা দর্শনের সুযোগ লাভ করে। আপাদমস্তক সত্য–চরম সত্য কুরআন শরীফ এবং সত্যের বাস্তব চিত্র আঁ-হযরত এর মোবারক ব্যক্তিত্ব। অনুরূপভাবে খোদাতাআলার নবীগণ প্রেরিতগণ মূর্তিমান সত্য ও ন্যায় হয়ে থাকেন। অতএব, যখনই কেউ এ সত্যের কাছে পৌছে যায় তখনই তার চোখ খুলে যায় এবং সে বিশেষ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। যার ফলে সে কুরআনের রূহানী তত্ত্ব জ্ঞান বা মা'রেফত লাভ করতে শুরু করে। আমি কখনই একথা মানতে প্রস্তুত নই যে, এমন ব্যক্তি, যে সত্যকে ভালবাসে না, ন্যায়পরায়ণ হয়না সে কুরআনী মা'রেফত জানতে বা বুঝতে সক্ষম হতে পারে। এ জন্য যে তার আত্মার বা হৃদয়ের সাথে এর কোন মিল নাই। কারণ কুরআন তো সত্যের উৎস- এখান থেকে সে-ই পেতে পারে যে সত্যকে ভালবাসে" (মলফূযাত; ১ম খন্ড; ৩৬৫ পৃষ্ঠা)।

হযরত (আঃ) বলেছেন– "আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি যে, কুরআন মজিদে বহু হাজার নির্দেশ রয়েছে। এসব নির্দেশকে মানুষ সাধারণত মেনে চলে না। সামান্য সামান্য কারণেই নির্দেশের বিপরীত করা হয়। দেখা গেছে দোকানদারেরা কিছু মিথ্যা কথা বলে। কোন কোন মিথ্যা তো খুব রং দিয়ে বলে। অথচ আল্লাহ্তাআলা মিথ্যাকে 'রিজ্স' (অপবিত্রতা) এর সাথে রেখে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষ কথা বলার সময় বিভিন্ন রং মিশিয়ে বলা থেকে বিরত হয় না এবং এমন করাকে কোন পাপ বলে মনেই করে না। হাসতে হাসতেও মিথ্যা বলে দেয়। মানুষ যতক্ষণ সকল প্রকার, সকল শ্রেণীর মিথ্যা বলা থেকে বিরত না হয় ততক্ষণ তাকে সিদ্দীক বলা যায় না (অর্থাৎ সকল প্রকার মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে)"।

হযরত (আঃ) আরো বলেছেন– "খোদাতাআলা আমাকে এজন্য প্রত্যাদিষ্ট করে [মা'মুর বা প্রেরিত] পাঠিয়েছেন (আমরা আহমদীরা মেনে নিয়েছি যে তিনি মসীহ্ মাওউদ হয়ে প্রেরিত হয়েছেন) যেন তাকওয়া এবং খোদাতাআলার উপর এমন ঈমান পয়দা হয় যা মানুষকে পাপ থেকে বাঁচায়। খোদাতাআলা প্রায়শ্চিত্ত চান না, বরং তাকওয়া চান" (মলফুযাত; ৫ম খন্ড; ১২০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের প্রত্যেককে সত্যের উন্নত মানের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন, মিথ্যার প্রতি অবজ্ঞা ও আমাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করুন। প্রত্যেক আহমদী যেখানেই যাক, কেউ যেন কখনই আংগুলের ইশারা করতে না পারে যে, ঐ দেখ মিথ্যুক যাচ্ছে। বরং আহমদীদেরকে লক্ষ্য করে যত আংগুলই উঠুক, প্রত্যেক আংগুল যেন এই বলে ইশারা করে যে, সত্যের প্রতীক যদি কেউ দেখতে চাও তো ঐ দেখ একজন আহমদীকে দেখ, যাচ্ছে। যদি কেউ কোন জাতির মধ্যে সত্যকে দেখতে চাও এ জগতে যদি কেউ বর্তমান যুগে সত্যবাদিতা দেখতে চাও, তাহলে আহমদীদের মধ্যে গিয়ে দেখ। প্রত্যেক আহমদী তা সে আমেরিকার অধিবাসী হোক বা ইউরোপের হোক, যে কেউ দেখে যেন বলে যে, আহমদীদের বিশেষ চিহ্ন বা পরিচয় এই যে, তারা সত্যবাদী।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের চরিত্রের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং আমাদেরকে অনুরূপ আমল করার তৌফিক দান করুন।

(আল ফযল লন্ডন; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ইং)।

অনুবাদ - **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত মানবতার সেবায় বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার উত্তম নমুনা সৃষ্টি করেছে। আরো আহমদী ডাক্তারেরা মানব সেবার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে আল্লাহ্‌র ফযলের ওয়ারিশ হোন

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৭ অক্টোবর, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে হযরত আমীরুল মো'মেনীন বলেন ঃ

আহমদীয়া জামাতে সৃষ্টির সেবা বা মানব জাতির সেবার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থাশালী, প্রত্যেক গরীব আহমদী নিজ সামর্থ অনুযায়ী সর্বদা চেষ্টারত থাকে যে, কোথায় কিভাবে সেবার সুযোগ লাভ করা যায় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে সেবা দানের সুযোগ পেতে চায়। আহমদীরা কেন এত উদার মনের অধিকারী? এজন্য যে, ইসলামের চমৎকার শিক্ষা যা ইতিপূর্বে আমরা ভুলে ছিলাম তা এই যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে চাও তাহলে তার সৃষ্টির সেবা কর, প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাচরণ কর, তার কি প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টি রাখ, এটাও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের একটি উত্তম উপায়। ইসলামের এত চমৎকার এই শিক্ষাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর বয়াতের একটি মৌলিক শর্ত হিসাবে সংযোজিত করেছেন যে, যদি তোমরা আমার সাথে সম্পৃক্ত হতে চাও তাহলে বয়াতের পরে তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত খরচ করে, মানুষের সাথে সহমর্মিতা প্রদর্শন করে মানুষের মঙ্গল কর। এ জন্যই দেখা যায় যে, ভুমিকম্প পীড়িতদের জন্য সাহায্যের প্রয়োজনে আহমদীরা প্রথম সারিতে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, বন্যার পানির প্রবল স্রোতে আহমদী সেচ্ছাসেবী নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে কিন্তু যে ডুবতে যাচ্ছিল তাকে কিনারায় পৌঁছে দিয়েছে। যুগ খলীফা যখন ঘোষণা দিলেন যে, আফ্রিকার গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাও স্বাস্থ্যের জন্য, দুঃখ-দুর্দশা জর্জরিত মানুষের চিকিৎসার জন্য স্কুল ও হাসপাতাল খুলতে হবে, এজন্য এত টাকার প্রয়োজন। জামাতের সদস্যরা যুগ খলীফার আহ্বানে মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে যত টাকা চাওয়া হয়েছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা যুগ খলীফার সামনে এনে দিয়েছিল। তারপর যুগ খলীফা বললেন তোমরা টাকা তো সরবরাহ করেছ এখন হাসপাতাল ও স্কুলের জন্য ডাক্তার ও শিক্ষকের প্রয়োজন। সাথে সাথে আহমদী নিবেদিত প্রাণ ডাক্তার ও শিক্ষকগণ নিজেদেরকে পেশ করে দিলেন। এখন তো আফ্রিকার অবস্থা অনেক ভাল। সত্তরের দশকে যখন নুসরত জাহান স্কীম আরম্ভ হয়েছিল তখন তো অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। ঐ খারাপ অবস্থার যুগে আমাদের ঐ ডাক্তারগণ ও শিক্ষকগণ কাজ করেছেন। তাদের অনেক ভাল ভাল চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঐ স্কীমের অধীনে আফ্রিকার গ্রামে গিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। অনেক জায়গায় বিদ্যুত ছিল না, পানিও ছিল না। কিন্তু দুঃখী মানবতার সেবার যে প্রতিজ্ঞা তারা বয়াতের শর্তের সাথে করেছিল তা পূরণ করতে কোন প্রকার বাধা বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। প্রথম দিকে হাসপাতালের অবস্থা এমন ছিল যে, সেখানে কাঠের টেবিলের উপর রুগীকে শুইয়ে দিয়ে আলোর জন্য হারিকেন অথবা গ্যাস বাতি দিয়ে চাকু ছুরি কেঁচি দিয়ে অপারেশন করেছেন এবং দোয়া করেছেন-হে আল্লাহ্! আমার হাতের কাছে যা পেয়েছি তা দিয়ে রুগীর চিকিৎসা করেছি, আমার খলীফা বলেছেন দোয়া দিয়ে চিকিৎসা করবে; আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের হাতে আরোগ্য দিবেন।' অতএব, হে আল্লাহ্! তুমি আমার রোগীকে আরোগ্য দান কর। আল্লাহ্‌তাআলা ঐ ডাক্তারদের কুরবানী কবুল করেছেন এবং এমন এমন দূরারোগ্য রুগীর আরোগ্য লাভ করেছে যে, সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেছে। তারপর আর্থিক সংকট আল্লাহ্‌তাআলা এভাবে দূর করে দিলেন যে, শহরের বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা শহরের বড় বড় হাসপাতাল ছেড়ে আমাদের গ্রামের দরিদ্র হাসপাতালে এসে নিজেদের চিকিৎসা করাতে আরম্ভ করলেন। অনুরূপভাবে শিক্ষকরাও মানবতার সেবার গুরুত্ব অনুভব করে বড় আন্তরিকতার সাথে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে থাকলেন। ডাক্তার ও শিক্ষকগণ আজও অনুরূপ আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্‌তাআলা এ ব্যবস্থাপনাকে চালু রাখুন এবং আমাদের সকল সেবকবৃন্দকে বড় বড় পুরস্কার দিতে থাকুন।

জলসার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম আমাদের ডাক্তার সাহেবরা আফ্রিকার হাসপাতালের জন্য জীবন উৎসর্গ (ওয়াক্‌ফ) করুন। অথবা ওয়াকফে আরযি করুন। বর্তমান কালে আফ্রিকায় আমাদের হাসপাতালগুলোর অবস্থা অনেক ভাল। আমাদের ওয়াকেফীন ডাক্তাররা প্রথম দিকে যেরকম প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এখন প্রায় সকল স্থানেই অবস্থার উন্নতি হয়েছে। যদি কোথাও কিছু সমস্যা থাকেও তাহলে বয়আতের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি সামর্থকে মানুষের সেবায় লাগানো উচিত। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পালনে এগিয়ে আসুন এবং তাঁর (আঃ) দোয়ার ওয়ারিশ হোন। অনুরূপভাবে ফযলে ওমর হাসপাতাল রাবওয়ার জন্যও ডাক্তার প্রয়োজন। ওখানকার জন্যও ডাক্তাররা নিজেকে পেশ করুন।

তারপর পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশেও সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী ব্যয় আছে যা জামাতের সদস্যদেরকে আর্থিক সাহায্য আকারে দেয়া হয়। পাকিস্তান হিন্দুস্থানের মত দেশে যেখানে গরীবদের সংখ্যা বেশি সেখানে এ ধরনের একটি বড় ব্যয় আছে। এ খাতে অর্থ সাহায্য করে আপনারা গরীব রোগীদের দোয়া পেতে পারেন। সুতরাং এ পুণ্য কর্মে আপনাদের সহযোগিতা জারী থাকা উচিত এবং পূর্বের তুলনায় বেশি সহযোগিতার প্রয়োজন। কারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবার আমাদের প্রথম যুগের বুযূর্গান যারা মানব সেবায় অগ্রগামী ছিলেন, তাদের কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

হযরত মির্যা আইয়্যুব বেগ (রাঃ)-এর খেদমতে খালকের নমুনা সম্পর্কে একজন বর্ণনা করেছেন ঃ

"মরহুম [মির্যা আইয়্যুব বেগ (রাঃ)] একটি জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন। হাদীসে যেমন উল্লেখ আছে যে, 'মোমেন তার ভাইয়ের জন্য ঐ সব কিছু পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে'। সে কখনও কারো সাথে এমন ব্যবহার করে না যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে না। সে সদাসর্বদা সুযোগ খুঁজতে থাকে যে, কিভাবে কোন মানুষের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়; কখন কোন ভাইয়ের সাহায্য করার সুযোগ লাভ করা যায়। তিনি যখন কলেজে পড়াশুনা করতেন জামাতের পক্ষ থেকে যখন কোন বক্তৃতা উপস্থাপন করা হতো, তিনি নিজেও আসতেন, অন্যদের নিয়ে আসতেন। এজন্য সকলের সাথে গিয়ে দেখা করতেন। সকলের খোঁজ খবর রাখতেন। কেউ অসুস্থ হলে তার খোঁজ নিতেন। প্রায় প্রতিদিন রোগী দেখতে যেতেন। একবার হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় অনবরত বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত মির্যা আইয়্যুব বেগ সাহেব মুফতী সাহেবের বাসায় থাকতেন। রাতেও তাঁর সেবা করতেন। কোন কোন সময় রোগীর ময়লাও পরিস্কার করতে হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় তা করেছেন" (আসহাবে আহমদ; ১ম খন্ড; ১৯৯ পৃষ্ঠা)।

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, "আল্লাহ্তাআলা শত্রু না হন তাহলে অন্য কোন শত্রু আমার কি ক্ষতি করতে পারে? অতএব, আমি কখনই কাউকে শত্রু মনে করি না। তিনি শত্রুদের সাথেও খুব সৎ ব্যবহার করতেন। বলতেন, যাদের উপর মন খুশি থাকে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে তো সবারই মন চায়। এতে পুণ্যের কি আছে? আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য তো মানুষের উচিত তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করা যাদের প্রতি মন খুশী থাকে না"। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তিনি ডাসকায় থাকতেন। সেখানে সকলের সাথেই খুব ভাল ব্যবহার করতেন। অনেক দান খয়রাত করতেন। মানুষও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। যে যুগে আহরারী জামাতের পক্ষ থেকে আহমদী জামাতের বিরোধিতা আরম্ভ হলো-তখন ডাসকা শহরেও তার প্রভাব পড়ল। যারা ইতপূর্বে সাহায্য সহযোগিতা পেত তারাই এখন শত্রুতা করতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু হযরত চৌধুরী সাহেবের মা এতে প্রভাবান্বিত হলেন না। দান খয়রাত আগের মতই করতে থাকলেন। আত্মীয়দের কেউ এসে যদি বলত, আপনি অমুককে সাহায্য করছেন সে তো আমাদের জামাতের বিরোধিতা করছে, সে তো আহরারী জামাতের সদস্য! তিনি শুনে অসন্তুষ্ট হতেন যে, তোমরা আমাকে কেন দোষারোপ করছ? আমি তো আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা করছি!

একবার এই মা, কারো জন্য কাপড়-চোপড় প্রস্তুত করছিলেন। ঐ আত্মীয় গিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কার জন্য এ সব কাপড় প্রস্তুত করছেন। হযরত চৌধুরী সাহেবের মা বললেন, অমুকের মেয়ের বিয়ের জন্য কাপড় বানাচ্ছি। তিনি বললেন, আরে আশ্চর্য কথা, বলেন কি? সে তো আহরারী এবং আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে! তার মেয়ের জন্য কাপড় বানাচ্ছেন?

হযরত চৌধুরী সাহেবের মা বললেন, সে তো বিরোধিতা করছে, কিন্তু আমার খোদাতাআলা তো আমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন! সুতরাং তাদের বিরোধিতার ফলে আমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না! কিন্তু এ ব্যক্তি তো নেহায়েত গরীব লোক। তার ছেলে মেয়ের তো শরীর ঢাকার কাপড় নেই! অতএব, তাদের প্রয়োজনের খাতিরে আমি এসব কাপড় প্রস্তুত করছি। তুমি যে আপত্তি তুলেছ তোমার শাস্তি এই যে, যখন এসব কাপড় তৈয়ার হয়ে যাবে তখন তুমি গিয়ে এসব তাদের বাড়ীতে দিয়ে আসবে। আরো বললেন, তুমি কাপড় দিতে রাতের বেলায় যাবে। কারণ দিনে অন্যরা দেখে ফেলতে পারে। কেউ যেন তাকে টিটকারী না করে যে, 'তুমি আহমদীদের থেকে কাপড় সংগ্রহ করেছ' [আসহাবে আহমদ; ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা]।

তিনি বিধবা, এতীম, অসহায়দের সাহায্য করতেন খুব যত্ন সহকারে করতেন, আনন্দের সাথে করতেন। কোন গরীব কন্যার বিয়ের জন্য কাপড় প্রস্তুত করতেন তো খুবই মনোযোগ দিয়ে সুন্দর করে করতেন [ঐ-পৃষ্ঠা ১৮৬]।

হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ) ও এতীম সন্তানদের প্রতি নজর রাখতেন। এতীমখানার ছেলেদের জন্য সব ব্যবস্থা করতেন। একবার জ্বরাক্রান্ত হয়ে বাসায় বিশ্রামে ছিলেন। খুব দুর্বল ছিলেন, প্রচন্ড জ্বর ছিল। কর্মচারী এসে খবর দিল এতীমখানার ছেলেদের যথেষ্ট খাদ্য শস্য নেই। ব্যবস্থা করা যায়নি। মীর সাহেব বললেন শীঘ্র টমটম গাড়ী নিয়ে আসে। তিনি ঐ জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় এতীমখানার ছেলেদের জন্য খাদ্য দ্রব্য জোগাড় করতে টমটমে বসে রওয়ানা দিলেন। অবস্থা যাদের ভাল ছিল তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এতীমখানার জন্য খাদ্যদ্রব্য জমা করে আনলেন যেন তারা খেতে পারে। দেখুন কেমন মমতাবোধ ছিল যে, অসুস্থ অবস্থায় বড় কষ্টের মধ্যেও আরাম পরিত্যাগ করে নিজেই যাত্রা করলেন। তিনি কেন এমন করেছিলেন? তিনি জানতেন, আঁ-হযরত (সঃ) এর সুসংবাদ তাঁর জানা ছিল। আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন জান্নাতে আমার সাথে তারা থাকবে যারা এ পৃথিবীতে এতীমদের দেখাশুনা করেছে, এমন যেমন দু'টি আঙ্গুল পাশাপাশি থাকে। আঁ-হযরত (সঃ) শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যাংগুলি একত্রিত করে দেখিয়েছেন। সুতরাং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের নমুনা এমন ছিল।

হযরত হাফেয মুঈনউদ্দীন (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি চোখে দেখতেন না। বর্ণনাকারী বলতেন, একদিন শীতকালের বর্ষার মধ্যে কাদিয়ানের সড়কে গলীতে খুব কাদা ছিল। হযরত হাফেয সাহেব বড় কষ্টে কাদা ভেঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। কোন একজন জিজ্ঞাসা করলেন, হাফেয সাহেব কোথায় যাচ্ছেন? হাফেয সাহেব বললেন, ওখানে একটি কুকুরী ছানা জন্ম দিয়েছে, এ বৃষ্টিতে কুকুর ছানাগুলো নিশ্চয় না খেয়ে থাকবে। আমার কাছে একটি রুটি আছে। বৃষ্টির দিন। তাই রুটিখানা তাদের দিয়ে আসি। হযরত হাফেয সাহেবের একাজটি ও আঁ হযরত (সঃ) সুন্নতের অনুকরণে ছিল যে, 'পশুদের সাথেও দয়া কর'।

এই ঘটনা স্মরণ রাখ যে, কেউ একজন নিজের জুতায় করে কুয়া থেকে পানি তুলে এনে কুকুরকে পান করিয়েছিল এবং তার এই পুণ্য কর্মের জন্য তার সমস্ত পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেছিলেন। সাহাবা (রাঃ) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, জীব জন্তুর প্রতি দয়া

করাও কি ছওয়াব হবে? আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, হাঁ প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া ও সদাচরণের ছওয়াব আছে।

আরেকটি ঘটনা- এক আহমদী হযরত নূর মোহাম্মদ, তীব্র শীতের মৌসুম ছিল। তার কাছে কোন কম্বল বা গরম কাপড় ছিল না। কেবল শরীরে দু'টি জামা ছিল। ট্রেনে সফর করছিলেন। এক বৃদ্ধ পঙ্গু যার শরীরে কোন কাপড় ছিল না। তিনি তখনই দু'টি জামার একটি খুলে ঐ বৃদ্ধকে পড়িয়ে দিলেন। সাথে একজন শিখ যাত্রী ছিল সে দেখে বলল, ভাই! তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে। তুমি কে ভাই! তোমার ঠিকানা কি? এটা ছিল আমাদের পূর্ব পুরুষদের নমুনা।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। একদিন সকালে উক্ত নূর মোহাম্মদ সাহেব ফযরের নামাযে মুঘলপুরা (লাহোর) মসজিদে গেলেন। গায়ে নতুন কম্বল ছিল। দেখুন, ফতেহ্ দ্বীন নামের এক বৃদ্ধ যে কোন সময় বড় অবস্থাশালী ব্যক্তি ছিল। কিন্তু আজ খালি হাতে খালি গায়ে শীতে কাঁপছে। নূর মোহাম্মদ সাহেব তার নতুন কম্বলখানা তাকে দিয়ে দিলেন (রূহ্ পারওয়ার স্মরণীয় ঘটনাবলী; পৃষ্ঠা ২৮৭)।

তারপর ১৯৪৭ইং সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় লক্ষ লক্ষ মুসলমান বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে কাদিয়ানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। মুসলমান নারীদের সম্ভ্রম নিরাপদ ছিল না। কিন্তু সবাই মনে করত যে, আমরা কাদিয়ান পৌছে গেলেই নিরাপদ হয়ে যাব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) হযরত মির্যা নাসের আহমদকে [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ)] সকলের আবাসন ও পাকিস্তান প্রেরণের ইনচার্জ নিযুক্ত করেছিলেন। যারা কাদিয়ান এসেছিল তারা সমস্ত আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় ফেলে নিজ গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল। কারো কাছেই যথেষ্ট কাপড় বা জিনিসপত্র ছিল না। হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব নিজ খান্দানের সকলের কাছ থেকে কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে ঐ সব মুসলমান নারী পুরুষদের দিয়েছিলেন এবং সবাইকে শৃঙ্খলার সাথে পাকিস্তান পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আহমদীরা সে সময় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, বড় কুরবানী দিয়ে এতবড় খেদমতে খাল্ক (মানবতার সেবা) সম্পাদন করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়আতের আর একটি শর্ত এক রকম ছিল যে, আমরা এ অঙ্গীকার নিয়ে হযরত (আঃ) বয়াত করে এ জামাতে শামিল হচ্ছি যে, বয়াতের পরে আমাদের কোন কিছু আর আমাদের থাকবে না। এরপর আমাদের সকল প্রকার আত্মীয়তা, সকল প্রকার সম্পর্ক কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের নেযাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সম্পর্ক থাকবে। এমন কোন সম্পর্ক আমাদের কারো সাথে থাকবে না যার কারণে আমরা হযরত (আঃ) থেকে সরে যেতে পারি। আমরা তো তাঁর দরজার ফকীর এবং এটাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তারপর এ অঙ্গীকার পালন করা হয়েছে এভং খুব সুন্দর করে পালন করা হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি এবং হযরত ইমামুয্জামান এর পবিত্র লেখা থেকে পেশ করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ "অনুরূপভাবে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব, যিনি আমার জামাতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকার চমৎকার লেখা লিখছেন। সাহেবযাদা পীর-সিরাজুল হক নোমানী সাহেব হাজার হাজার মুরিদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে এসে দরবেশী জীবন যাপন করছেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সনৌরী, মৌলভী বুরহানউদ্দীন সাহেব ঝিলামী, মৌলভী মোবারক আলী সাহেব শিয়ালকোটী, কাযী জিয়াউদ্দীন সাহেব কাযী কোটী, মুন্সী চৌধুরী নবী বখশ্ সাহেব বাটালা জিলা গুরুদাসপুর, মুন্সী জালাল উদ্দীন সাহেব মিয়ানী এবং আরো অনেকে নিজ নিজ সাধ্য সামর্থ অনুসারে খেদমতে (সেবা) রত আছেন। আমি আমার জামাতের আন্তরিকতা ও ভালবাসা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাদের অনেকে খুবই অল্প আয় করে, যেমন মিয়া জালালউদ্দীন, মিয়া ইমামউদ্দীন, কাশ্মিরী আমার গ্রামের পাশের গ্রামে থাকে। এরা তিন ভাই যারা সম্ভবত দিনে তিন চার আনা আয় করে, দিন মজুর; কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহের সাথে প্রতি মাসে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে। তাদেরই দোস্ত মিয়া আযীয পাটওয়ারীর আন্তরিকতা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। অত্যন্ত স্বল্প আয় সত্ত্বেও একদিন আমাকে একশ টাকা দিয়ে বলল যে, ইসলামের সেবায় এ টাকা যেন আমি ব্যয় করি। তার একশ টাকা খোদা জানেন কত মাসে কষ্ট করে জমা করেছে। কিন্তু আল্লাহ্র খাতিরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এনেছে' আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন ১১ খন্ড; ৩১৩ পৃঃ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) সম্পর্কে হযরত (সঃ) লিখেছেন ঃ "অনেক ধন সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য কিছু অংশ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে এমন অনেক দেখেছি। কিন্তু নিজে অভুক্ত, পিপাসার্ত থেকে নিজের প্রিয় সম্পদকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুলে দেয়া এবং নিজের জন্য পৃথিবীতে কিছুই না বানানো এ গুণ পূর্ণ মাত্রায় কেবল মৌলভী সাহেবের মধ্যেই দেখেছি। যে পরিমাণ সাহায্য তিনি তাঁর মাল-দৌলত দিয়ে আমার করেছেন তার আর কোন নজির এ পর্যন্ত আমার কাছে নেই" [নিশানে আসমানী; রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, ৪০৭ পৃঃ]।

হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে লিখেছিলেন ঃ

"আমি আপনার পথে কুরবান (প্রাণ দিতে প্রস্তুত) হয়েছি। আমার যা কিছু আছে তা আমার না– আপনার। হে আমার পীর ও মুরশিদ! (পথ প্রদর্শক) আমি সত্যি সত্যিই বলছি, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ যা আছে সবই যদি আল্লাহ্র ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় হয় তাহলে আমি মনে করব যে, আমি সার্থক হয়েছি" [ফাতেহ্ ইসলাম; রূহানী খাযায়েন, ৩ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন।

"হিব্বি ফিল্লাহ্ (আল্লাহ্র কারণে ভালবাসা) মুন্সী জাফর আহমদ যিনি একজন ন্যায়পরায়ন। কম কথা বলেন, আন্তরিকতায় যার অন্তর পরিপূর্ণ, যিনি সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী অর্থাৎ বড় সূক্ষ্ম বিষয় ও যার নজরে পড়ে, যার চেহারায় দৃঢ়তা ও নূর প্রতীয়মান, অত্যন্ত সংযমী, ভদ্রতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী, প্রমাণিত সত্যকে খুব বুঝে নিতে পারেন এবং তা থেকে স্বাদ উপভোগ করেন, আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর সাথে প্রকৃত ভালবাসা রাখেন। শিষ্টাচার ও ভদ্রতা যার উপর সমস্ত কল্যাণ প্রাপ্তি নির্ভর করে এবং সুধারনা, সৎবিবেচনা যা এ পথের পাথেয়, উভয় চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়।

অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া এবং সুধারনা যে দুইয়ের সমন্বয় এ পথের জন্য আবশ্যক, এ দুই গুণই তার মধ্যে রয়েছে। জাযাযাহুমুল্লাহ্ খায়রুল জাযায়া"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মিয়া আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী সম্পর্কে লিখেছেন,

হিব্বি ফীল্লাহ্, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সান্নোরী যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ যুবক, নিজের প্রকৃতিগত মিল থাকার কারণে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তিনি আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুদের অন্তর্গত, কোন প্রকার পরীক্ষা বা বিপদ তার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করতে পারবে না"। অর্থাৎ কোন প্রকার বিপদ তাকে স্থানচ্যুতি করতে পারবে না। তিনি বিভিন্ন সময় দুই-দুই, তিন-তিন মাস পর্যন্ত বরং কোন সময় তারও বেশি সময় আমার সাথে অবস্থান করেছেন। আমি সব সময় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে তার ভিতরের অবস্থা অবলোকন করেছি।" (অর্থাৎ গভীরভাবে তাকে লক্ষ্য করেছি) "আমার অন্তদৃর্ষ্টি তার ভেতরে যা দেখেছে তা এই যে, এই যুবকের মধ্যে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র ও রাসূল (সঃ) ভালবাসার এক উষ্ণতা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমার জন্যও তার মধ্যে এত গভীর ভালবাসা বিদ্যমান যে, তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর একজন প্রেমিক এবং এছাড়া আর কিছুই না" এযালায়ে আওহাম; রূহানী খাযায়েন; ৩ খন্ড, ৫৩১ পৃঃ)।

হযরত মুন্সী আরোরা সাহেব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ "হিব্বি যীল্লাহ্ মুন্সী মোহাম্মদ আরোড়া, ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে নকশা লেখক, একজন জীবন্ত, ভালাবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি সত্যের প্রেমিক, সত্যকে চট করে চিনে ফেলতে পারেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খেদমতে নিয়োজিত, অত্যন্ত আনন্দের সাথে খেদমত করেন। বরং তিনি রাত দিন কেবল একমাত্র একই চিন্তা করেন যে, কোন খেদমতের সুযোগ লাভ করেন। তাঁর অন্তর আলোকিত এবং তিনি প্রাণ দিতে ও প্রস্তুত। অর্থাৎ উন্মুক্ত হৃদয়ে কবুল করেন তিনি যা কবুল করেন এবং সেজন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়ে যান।" আমি মনে করি যে, এ ব্যক্তি আমার জন্য গভীর ভালবাসা নিমজ্জিত। সম্ভবতঃ এর বেশী তার খুশীর বিষয় কিছুই নাই যে, কিভাবে তিনি নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ, সম্পদ এমনকি নিজ সত্তার বিনিময়ে হলেও যেন আমার কোন প্রকার খেদমতের সুযোগ লাভ করবেন। তিনি জান-প্রাণ দিয়ে বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী, স্থায়ী ও স্থীর অবস্থার অধিকারী এবং বড় সাহসী ব্যক্তি। প্রত্যেক অবস্থাতেই তিনি তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারেন এবং বড় শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী এবং বড় সাহসী। "আল্লাহ্‌তাআলা তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন"।

তারপর হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ

"হিব্বি ফীল্লাহ্ মিয়া মোহাম্মদ খান সাহেব যিনি কপূর্থলা রাজ্যে চাকরী রত। অত্যন্ত গরীব স্বভাবের, পবিত্রাত্মা, তিক্ষ্ম মেধার অধিকারী, সত্য প্রেমিক," অর্থাৎ তিনি সুক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতার অধিকারী ন্যায় তার প্রেমিক ন্যায়পরায়ণ। "তিনি আমাকে কতটা শ্রদ্ধা করেন, কত ভালবাসেন, কতবেশী সুধারণা রাখেন আমার সম্পর্কে আমি তার গভীরতা অনুমান করতে পারিনা। তার সম্পর্কে আমার কোন আশংকা নেই যে, এতবেশী আমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কখনও তা কমে যাবে কি না-বরং আমি আশংকা করি যে, আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ সীমা অতিক্রম করে যায় কি না। তিনি অতি বিশ্বস্ত, অতি দৃঢ় অবস্থানের অধিকারী, সবকিছু কুরবান করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহ্ সর্বদা তার সঙ্গী হোন। তার ভাই সরদার আলী খান ও আমার বয়াতের নেযামের অন্তর্ভুক্ত। এই কিশোর ও তার ভাইয়ের মতই অত্যন্ত ভাগ্যবান পুন্যবান ও হেদায়াত প্রাপ্ত।" অত্যন্ত সৎ এবং সরল সোজা পথের পথিক, 'খোদাতাআলা তাদের হাফেয ও নাসের হোন" (এযালায়ে আওহাম; রূহানী খাযায়েন; ৩ খন্ড; ৫৩২ পৃঃ)।

হযরত আকদাস (আঃ) আরো লিখেছেন ঃ "আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই যার চির বিদায় আমাদের অন্তরে দাগ কেটে গেছে মির্যা আযম বেগ সাহেব মরহুম ও মগফুর [যার মাগফেরাত (ক্ষমা) হয়েছে] পাটিয়ালা রাজ্যের সামান্য অঞ্চলের রঈস (নবাব) ছিলেন। তিনি ২রা রবিউস্ সানী ১৩০৮ হিঃ ইহধাম ত্যাগ করে গেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। বলা হয়, "চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয়, মন ভারাক্রান্ত হয়, আমরা তার অন্তর্ধানে ব্যথিত।" মির্যা সাহেব মরহুম যতটা আমাকে ভালবাসতেন, আমার জন্য ফানা [নিজকে উজাড় করতেন] হতেন তা ভাষায় ব্যক্ত করার ভাষা কোথায় পাব যে, তাঁর মর্যাদা বয়ান করব? তার অকালমৃত্যু আমাদের থেকে তাকে দুরে নিয়ে গেছে (এতে আমরা এত কষ্ট পেয়েছি যে, অতীতে এমন খুব কমই ঘটেছে। তিনি আমাদের একজন এবং আমাদের লক্ষস্থলের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে তার স্থান অনেক উপরে। তিনি একজন খুবই ভাল মানুষ, অগ্রগামী এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল, যিনি দেখতে দেখতে আমাদের থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব তার ব্যাথা আমরা ভুলতে পারব না। তার চির বিদায়ের কথা স্মরণ হলে মন খারাপ হয়ে যায় বুকের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, মন কষ্টের কারণে চোখ দিয়ে পানি ঝরতে আরম্ভ করে। তিনি আপাদমস্তক ভালবাসায় ভরা ছিলেন মির্যা সাহেব মরহুমের তার মহব্বতের আবেগ প্রকাশে বড় সাহসী ছিলেন" [ফাতাহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন; ৩ খন্ড, ৩৯ পৃঃ]।

হযরত কাযী যিয়াউদ্দিন সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সামনে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"হে আমার অভিভাবক! আমার অন্তরে বিপরীত মুখী চিন্তা-ভাবনা পাচ্ছি। একদিকে আমার মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ যে হযরত আকদাস (আঃ) এর সত্যতা, হুযূর (আঃ)-এর রূহানী নূরসমূহ খুব শীঘ্র বহির্বিশ্বে বিকশিত হোক, মানুষ জেনে যাক। এবং সকল জাতির সকল ধর্মের লোকেরা আসুক এবং এ ঝর্ণা থেকে পান করুক যা আল্লাহ্‌তাআলা এখানে জারি করেছেন। কিন্তু আবার অপরদিকে ঐ একই সাথে আমার মনে এ ধারনা ব্যাথা জ্বলন সৃষ্টি করে যে, যখন অন্য লোকেরা হযরত (আঃ)-কে জেনে যাবে তখন অনেক বড় সংখ্যায় তারা এখানে আসতে শুরু করবে। এমন অবস্থায় আমি বর্তমানে যেভাবে হযরত (আঃ)-এর নিকটে থেকে বরকত লাভের সুযোগ পাচ্ছি তখন তা পাব না। তখন তো হুযূর অন্যদের গৃহে যাবেন।

হে আমার প্রিয় হযরত! আমি এখন হযরতের কাছে বসার ও কথা বলার যে আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ করছি, তখন তা পাব না। এ দু'ধরনের বিপরীত মুখি চিন্তাধারা আমার মনে আসতে থাকে"। হযরত কাযী যিয়াউদ্দীন লিখেছেন, তার কথা শুনে হযরত (আঃ) হেসে দিয়েছিলেন (আসহাবে আহমদ, ২য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা]।

কাযী জিয়া উদ্দীনের (রাঃ) এ নমুনা ছিল। আবার কাজী আব্দুর রহিম (রাঃ) এর বর্ণনা শুনুন। তিনি লিখেছেন, "একবার আব্বাজান বড় খুশীর সাথে বললেন, 'আমি ওযূ করছিলাম। হযরত (আঃ)-এর খাদেম হযরত হামেদ আলী হযরত (আঃ)-এর কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? হযরত (আঃ) আমার নাম ও ঠিকানা বললেন। আরো বললেন, "ইনি একজন আমার প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি।" হযরত কাযী আব্দুর রহিম খুব গর্ববোধ করতেন যে, হযরত (আঃ) আমার অন্তরের খবর কিভাবে জানলেন!' তার ঐ ভালবাসারই ফল ছিল এই যে, তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তানদের আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "আমি বড় কষ্ট করে তোমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দরজার উপর দিয়ে এসেছি। তোমরা কখনও এ দরজার চৌকাঠ ছেড়ে কোথাও যাবে না।" পরবর্তীতে তার সন্তানরা পিতার ওসীয়্যত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

হযরত মৌলভী নেয়ামতুল্লাহ্ সাহেবকে ১৯২৪ইং সনে কাবুল, আফগানিস্তানে শহীদ করা হয়েছে। শাহাদাত লাভের পূর্বে তিনি জেলখানা হতে এক আহমদী বন্ধুকে পত্র লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, "আমি এই জেলখানায় প্রতি মুহূর্তে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! (আমি) এই অযোগ্য চাকরের দ্বারা তোমার ধর্মের খেদমত করাবে। আমি জেল থেকে মুক্তি চাই না। বরং আমি চাই হে আল্লাহ্! এই অযোগ্য অধমের শরীরের এক এক কণা আহমদীয়তের জন্য কুরবান (যবেহ) হোক।" (তারিখে আহমদীয়াত; ৫ম খন্ড)।

তারপর বয়াতের দশম শর্তের মধ্যে আছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে বয়াতকারীর এত গভীর সম্পর্ক হবে যে অন্য কোন সম্পর্কই কারো সাথে এত গভীর হবে না। এবার হযরত ডাঃ সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ্ (রাঃ)-এর ঘটনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ছোট পুত্র সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ ১৯০৭ইং সনে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। টাইফয়েড জ্বরের প্রচন্ড আক্রমণ ছিল। তার অসুস্থ্যতার যুগে একজন স্বপ্নে দেখলেন যে, সাহেবযাদা মোবারকের বিয়ে হচ্ছে। স্বপ্নের তাবীরকারকগণ লিখেছেন, বিয়ে যদি অচেনা নারীর সাথে হয় তাহলে এর অর্থ হবে মৃত্যু। আবার অনেকে লিখেছেন, যদি বাস্তবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাহলে অনেক সময় মৃত্যু স্থগিত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বললেন, 'এর তাবীর মৃত্যু। তবে বাস্তবে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে মৃত্যু না-ও হতে পারে। অতএব, মোবারক আহমদের বিয়ে দিয়ে দেন'। অতএব, যে শিশু বিয়ে কাকে বলে জানতেন না, তার বিয়ে চিন্তা হযরত (আঃ) করলেন। যখন আলোচনা হচ্ছিল সে সময় ঘটনাক্রমে হযরত ডাঃ সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের পরিবার সৈয়্যদা সাঈদা বেগম সাহেবাকে [তারা মেহমান হয়ে হযরত (আঃ)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন)। উঠানে দেখা গেল। হযরত (আঃ) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমাদের ইচ্ছা হয়েছে মোবারক আহমদের বিয়ে দেব। আপনার মেয়ে আছে মরিয়ম। যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে আপনার মেয়ের সাথে মোবারক আহমদের বিয়ে দিয়ে দেয়া যায়। সৈয়্যদা সাঈদা সাহেবা বললেন, হুযূর আমার তো কোন আপত্তি নেই। তবু আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে ডাক্তার সাহেবের (মেয়ের বাবা) সাথেও কথা বলে নিতে চাই। সে সময় হযরত ডাক্তার সাহেব সপরিবারে গোল কামরায় অবস্থান করতেন। মেয়ের মা নিচে গেলেন। ডাক্তার সাহেব কোথাও বাইরে ছিলেন। কিছু সময় পরে ডাক্তার সাহেব আসলেন। বেগম সাহেবা ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা আরম্ভ করলেন এই বলে, যে অনেক সময় যারা আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করে তখন তাদের ঈমানের পরীক্ষাও দিতে হয়। আল্লাহ্ যদি আপনার ঈমানের পরীক্ষা নিতে চান, আপনি সেজন্য প্রস্তুত আছেন? মেয়ের মায়ের মনে ধারনা হচ্ছিল যে, মেয়ের বাবা অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রস্তাব কবুল করতে দ্বিধা করেন কিনা। কারণ এই মেয়ের মা বাবা সৈয়্যদ বংশের সদস্য। ইতিপূর্বে তারা কখনও সৈয়্যদ বংশের বাইরে বিয়ে শাদী করেননি। দ্বিতীয়ত ছেলে সাহেবযাদা মোবারক আহমদ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, ডাক্তার সাহেব নিজেই চিকিৎসা করছেন। বাহ্যত এ ছেলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। বিয়ের পরপরই মেয়ের বিধবা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। সুতরাং ডাক্তার দুর্বলতা দেখাতে পারেন এবং তাঁর ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই বিবিসাহেবা ডাক্তার সাহেবকে বললেন যে, ঈমানের পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না? হযরত ডাক্তার শাহ্ সাহেব বললেন, 'আমি আশা করছি আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে দৃঢ়তা দিবেন। তখন মেয়ের মা বললেন, 'আমি গিয়েছিলাম , হযরত আকদাস (আঃ) বলেছেন, তিনি মরিয়মের বিয়ে মোবারক আহমদ সাহেবের সাথে দিতে চান। এ কথা শুনে হযরত ডাক্তার সাহেব বললেন, "ভাল কথা তো; যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পছন্দ করেন তাহলে আমাদের তো দ্বিমত থাকতে পারে না"। এ কথায় মরিয়ম বেগমের মায়ের চোখে পানি এসে গেল। (আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উচ্চ মাকাদ দান করুন এবং তাকে উচ্চতা দিতে থাকুন) হযরত ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, তোমার কি পছন্দ নয়? বেগম সাহেবা বললেন, আমারও পছন্দ। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাকে যখন বললেন তখন থেকে আমার বুক ধরফড় করছিল আমি ভয় পাচ্ছিলাম এজন্য যে, আপনি ঈমান ঠিক রাখতে পারেন কিনা? এবার আপনার উত্তর শুনে খুশির তাড়ায় আমি চোখের পানি রোধ করতে পারিনি। অতপর বিয়ে হয়ে গেল অল্প কয়েকদিন পরই সাহেবযাদা মোবারক আহমদ মারা গেলেন এবং শিশু কন্যা সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম বিধবা হয়ে গেলেন।

তারপর দেখুন। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ডাক্তার সৈয়্যদ আব্দুল আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের (রাঃ) আন্তরিকতাকে কতটা মূল্য দিয়েছেন। সেই মরিয়ম বেগমের সাথে হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বিবাহিত হলেন। এবং তিনি [ইতিহাসে] উম্মে তাহের, মরিয়ম সিদ্দিকা রাযী আল্লাহো আনহা বলে পরিচিত [অর্থাৎ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ)-এর মাতা অনুবাদক] [দৈনিক আল ফযল, কাদিয়ান; ১লা আগস্ট, ১৯৪৪ইং]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ (রাঃ) সম্পর্কে নিখেছেন ঃ 'ঐ দিনগুলোতে বার বার আমার প্রতি ওহী নাযেল হোল, বড় বড় শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশিত হোল; আমার প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবীর সত্যতার যুক্তি প্রমাণ পৃথিবীতে প্রকাশিত হোল। আমার কয়েকখানা বই তখন ঘটনাচক্রে কাবুলের খোসত্ অঞ্চলের আখন্দযাদা মৌলভী আব্দুল লতিল সাহেবের হাতে পৌছে যায়। আমি যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ বিবেক বুদ্ধি দিয়ে এবং লিখিত দলিল আকারে আমি উপস্থাপন করেছি" [অর্থাৎ আল্লাহ্র সমর্থনে আমি আমার বইয়ে লিখেছি] ঐ সমস্ত দলিল প্রমাণ তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেহেতু তিনি পবিত্র আত্মা বুযূর্গ আলেম, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন খোদা-ভীরু, তাকওয়াশীল; তাই ও সমস্ত যুক্তি প্রমাণের শক্তিশালী প্রভাব তাঁর হৃদয়ের উপর পড়েছে এবং আমার এ দাবীর সত্যতাকে সমর্থন করতে তাঁর কোন অসুবিধাই হয়নি। অতএব, তাঁর পবিত্র বিবেক (Concence) কোন দেরী না করে মেনে নিয়েছে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তার দাবী সত্য। তারপর তিনি আমার বইগুলোকে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন। এতে করে তাঁর হৃদয় যা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল এবং আগে থেকেই সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে সেখানে বসে থাকা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে উঠে। অবশেষে অত্যন্ত শক্তিশালী আকর্ষণ, ভালবাসা ও আন্তরিকতার ফল হলো এই যে, তিনি হজ্জে যাবার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমীরের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করলেন। কারণ কাবুলের আমীরের দৃষ্টিতে তিনি একজন বড় বুযূর্গ আলেম এবং সেখানকার আলেমদের সরদার ছিলেন। সুতরাং তিনি অনুমতিও পেলেন এবং সাথে কিছু পথ খরচের জন্য টাকাও পেলেন। অনুমিত পাওয়ার পরে তিনি প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ানে আসলেন। আমার সাথে যখন তিনি দেখা করলেন, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁকে আমার আনুগত্যে এবং আমার দাবীর সত্যায়নকারী হিসাবে এমন নিবেদিত প্রাণ দেখলাম, এতবেশী তিনি নিবেদিত প্রাণ যে, এর বেশী কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তাঁর হৃদয় আমার ভালবাসায় এ রকম পরিপূর্ণ দেখলাম যেমন কোন সুগন্ধী আতরে ভরা শিশি হয় এবং তাঁর চোহারা যেমন ঐশী নূরে উজ্জ্বল দেখলাম, তেমনই তাঁর হৃদয় ও ঐশী নূরে পরিপূর্ণ বলেই আমার মনে হলো " [তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়নে, রূহানী খাযায়েন; ২০ খন্ড; ০৯-১০]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেনঃ

"এ স্থলে আমি এ কথার উল্লেখ না করে এবং আল্লাহ্তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না যে, আল্লাহ্ আমাকে একা নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেননি। আল্লাহ্র ফযলে, আমার সাথে যারা ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এ জামাতে প্রবেশ করেছেন, যে জামাতকে আল্লাহ্ নিজ হাতে কায়েম করেছেন, আন্তরিকতা ও ভালবাসায় তারা এক অদ্ভুত ও চমৎকার রং এ রঙ্গীন হয়েছেন। আমি আমার চেষ্টায় নয় বরং আল্লাহ্তাআলা নিজ ফযল ও কৃপায় সততায় পরিপূর্ণ রূহ্সমূহ আমাকে দান করেছেন। সর্বপ্রথম আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করার জন্য আমার অন্তরে উত্তেজনাবোধ করছি। তার আন্তরিকতাপূর্ণ নূর ভরা ব্যক্তিত্বের মতই তাঁর নাম নূরে দীন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য যে সমস্ত খেদমত তাঁর হালাল সম্পদ খরচ করে করে যাচ্ছেন তা আমি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করছি এবং আমার মন বলছে, হায়! আমি যদি এমন খরচ করতে পারতাম! তাঁর অন্তরে আল্লাহ্র ধর্মের সেবার যে আবেগ তা দেখে আল্লাহ্র ঐশী (তকদীর) পরিকল্পনার নকশা (রূপরেখা) আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনি কেমন কেমন বান্দাদেরকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। নুরুদ্দীন সাহেব নিজের ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ এবং সমস্ত আসবাবপত্র যা তার আওতার মধ্যে আছে তা ব্যয় করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করার জন্য প্রতিনিয়ত দন্ডায়মান আছেন। আমি আমার কল্পনা দিয়ে নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে সঠিকভাবে জানি যে, তিনি আমার পথে কেবল সম্পদ নয় বরং নিজের জান-প্রাণ-ইয্যাত ও বিসর্জন দিতে সামান্যও দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যদি আমি অনুমতি দিতাম, তিনি তার সবকিছু এ পথে ব্যয় করে যেমন রূহানীভাবে আমার পাশে আছেন, শারীরিকভাবেও আমার পাশে এসে অবস্থান করতেন এবং প্রতিটি মুহূর্ত আমার সাহচর্যে থাকতেন এবং কতর্ব্য পালন করতেন। তার কোন কোন পত্রের কয়েকটি বাক্য যা তিনি আমাকে লিখেছেন এখানে আপনাদের সামনে রাখছি যেন আপনারাও জানতে পারেন যে, আমার প্রিয় ভাই নুরুদ্দীন সাহেব ভেরবী; জম্মু রাজ্যের রাজার চিকিৎসক; আন্তরিকতা ও ভালবাসায় কত বড় উন্নতি করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"মাওলানা মুরশিদনা ও ইমামনা, আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। হে সম্মানিত! আমার দোয়া এই যে, আমি যেন হুযূরের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকতে পারি। যুগ ইমামের সহচর্যে অবস্থান করে ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিল করি যে উদ্দেশ্যে আপনি মুজাদ্দিদ হয়ে এসেছেন। আপনার অনুমতি পেলে আমি আমার কর্মস্থল থেকে পদত্যাগ করত রাতদিন সর্বক্ষণ আপনার সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়ে থাকতে চাই। অথবা যদি আদেশ হয় তাহলে সবকিছু পরিত্যাগ করে, সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে সত্য ধর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে থাকব এবং এ পথেই মৃত্যুবরণ করব। আমি আপনার রাস্তায় নিজকে কুরবানি (উৎসর্গ) করে দিয়েছি। আমার যা কিছু আছে এসব আমার না, আপনার। হযরত আপনি আমার পীর ও মুরশেদ। আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিবেদন করছি যে, আমার সমস্ত সম্পদ ধর্মের প্রকাশনার কাজে খরচ হয়ে যায় তাহলে আমি মনে করব যে, আমি সাফল্যমন্ডিত হয়েছি।...

আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ফারুকী সম্পর্ক (হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মত - অনুবাদক) আমি সবকিছু এ পথে ব্যয় করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দোয়া করবেন আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকীয়তের মৃত্যু হয়"।

প্রশংসিত মৌলভী সাহেবের সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, সহমর্মিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা যা তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝা যায় তার চেয়েও বেশী তাঁর অবস্থা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগের সাথে তিনি চান যে, তাঁর সব কিছু, এমন কি তার ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও এ পথে ব্যয় হয়ে যাক। তাঁর রূহ তাঁকে ভালবাসার আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর সমর্থের চেয়েও বেশি পদক্ষেপ গ্রহণের উৎসাহ দিচ্ছে। তিনি

প্রতিনিয়ত খেদমতে নিয়োজিত আছেন" [ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩ খন্ড; ৩৫ পৃষ্ঠা]।

একজন অভিযোগকারীর জবাবে হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ "আপনি বলছেন, কেবল একজন মৌলভী নূরুদ্দীন আছেন যিনি কাজে কর্মে সবদিক থেকে উত্তম নমুনার অধিকারী। আমি জানি না, আপনার এতবড় মিথ্যার জবাব কি দেব। তবে হলফ করে বলতে পারি যে, আমার জামাতে কমপক্ষে এক লক্ষ মানুষ আছে যাঁরা খাঁটি অন্তকরণে আমার প্রতি ঈমান রাখে এবং পুণ্যকর্ম করে তারা আমার কথা শুনে এত কান্নাকাটি করে যে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের বুক ভিজে যায়। আমার বয়আতকারীদের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এমন পরিবর্তন দেখেছি যা হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুসারী যারা তাঁর জীবদ্দশায় ঈমান এনেছিল তাদের মধ্যে এমন ছিল না আমার অনুসারীদেরকে সেই তুলনায় হাজার গুণ ভাল দেখছি। এদের চেহারায় সাহাবায়ে কেরামের চেহারার রং ও ছবি বিশ্বাস ও যোগ্যতার পাওয়া যায়। হ্যাঁ ব্যতিক্রম হিসাবে কিছু কিছু লোক তো দুর্বল প্রকৃতির হয়েই থাকে।"

আরো বলেছেন ঃ "আমি দেখি যে, আমার জামাতের মানুষেরা পুণ্যকর্মে ও সংশোধন প্রক্রিয়ার দিক থেকে এতটা উন্নতি করেছে তা একটি মো'জেযা বটে। হাজার হাজার মানুষ মনে প্রাণে নিবেদিত প্রাণ। আজ যদি তাদেরকে বলা হয় যে, 'তোমাদের সমস্ত ধন সম্পদ পরিত্যাগ কর তাহলে তারা তা করার জন্য প্রস্তুত আছে। তারপরও আমি তাদেরকে বার বার উৎসাহিত ও তাকিদ দিতে থাকি এবং তাদের নেকীর কথা তাদেরকে বলি না। কিন্তু মনে মনে খুশি হয়ে থাকি" (সিরাতুল মাহ্দী, ১ম খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা)।

আমি এখানে মাত্র কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রিয় জামাতের মধ্যে এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সময় কয়েক লক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ তো এ সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে এমন আছেন যাদের বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, দৃঢ়-সম্পর্ক, ভালবাসা, আনুগত্যের কথা প্রকাশিত হয় না। তারা নিরবে এসেছে, ভালবাসা, বিশ্বস্ততার দৃঢ় সম্পর্ক এবং আনুগত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে চলে গেছেন। এমন বুযূর্গান, মুখলেসীনদের সন্তানদের উচিত নিজেদের বুযূর্গদের কুরবানীর ইতিহাস (ঘটনাসমূহ) লিখে সংরক্ষণ করা। তারা জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতে ঐ সমস্ত ঘটনার রেকর্ড করে দিয়ে রাখুন এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত রাখুন। সন্তানদের জানিয়ে দিন যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা এমন এমন ত্যাগ করে গেছেন; আমাদেরকেও জারী রাখতে হবে। আমরা তাদের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি যে, তারা এ সমস্ত কুরবানির যুগ ইমামের দোয়ার ওয়ারিশ হয়েছেন। আজ আমাদের ঐ সব দোয়ার ফল সংগ্রহ করার সুযোগ এসেছে। আস আমরা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও ভালবাসার উদাহরণ সৃষ্টি করি এবং আল্লাহ্‌র ফযলের ওয়ারিশ হই। এবং হতে থাকি। স্মরণ রাখবেন, এমন উদাহরণ সৃষ্টি হতে থাকবে। ভূপৃষ্ঠের বিরোধিরা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ বাক্যটি চিরদিন স্মরণ রাখবেন। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।

আহমদী জামাতের সদস্যদের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা অ-আহমদীদের চোখেও পড়েছে এবং তারা তা বর্ণনাও করেছেন। সে সব পরিবর্তন এতই সুস্পষ্ট যে, তারা তা স্বীকার করতে ও বলতে বাধ্য হয়েছে। এবং এভাবে তারা মেনে নিয়েছেন যে, আহমদীরা যুগ ইমামকে মান্য করে অনেক বড় আকারে কল্যাণ মন্ডিত হয়েছে। কিন্তু নিজেরা তারা পুরাতন আচরণ করে চলেছেন যে, 'আমরা মানি না'। তাদের স্বীকৃতির কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করছি।

আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন; "পাঞ্জাবে ইসলামী চরিত্রের অকৃত্রিম নমুনা আমরা ঐ জামাতের আকারে দেখছি যাদেরকে কাদিয়ানী ফেরকা বলা হয়" [কওমী যিন্দিগী আওর মিল্লাতে বায়যা পার এক উমরানী নজর" পৃঃ ৮৪]।

আল্লামা নিয়ায ফতেহপুরী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে লিখেছেন; "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি নিশ্চয় ইসলামী চরিত্রকে পুনর্জীবিত করেছেন এবং এমন এক জামাত কায়েম করে দেখিয়েছেন যে সে জীবনকে নিশ্চয় আমরা আঁ-হযরতের (সঃ) নমুনার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলতে পারি"। (মুলাহেযাতে নিয়ায ফতেহ্পুরী পৃঃ ২৯)।

দিল্লীর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন–

"পবিত্র কাদিয়ান শহরে একজন হিন্দুস্তানী পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন যিনি তাঁর আশ পাশের লোকদেরকে উন্নত চরিত্র ও নেকী পুণ্যে ভরে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভাল ভাল গুণাগুণ তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুসারীদের মধ্যে ফুটে উঠেছে" [স্টেটস্‌ম্যান, দিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ইং)।

আব্দুর রহিম আশরাফ আজাদ সাহেব আহমদী জামাতের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"হাজার হাজার মানুষ এমন আছেন যারা নিজের ধর্মের খাতিরে নিজ পরিবার পরিজন থেকে সম্পর্কচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিরাট সাংসারিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিয়েছে, নিজের জান-প্রাণ কুরবান করেছে। ... আমার উন্মুক্ত হৃদয়ে-অন্তরে স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, কাদিয়ানী জনগণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এমন আছে যারা অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে বুঝে জেনে তাদের ধর্মমতের খাতিরে জান-প্রাণ জাগতিক বিষয়-সম্মত্তি, resorces এবং সকল প্রকার সম্পর্ককে কুরবানী দিয়েছে। এদেরই কোন কোন সদস্য কাবুলে মৃত্যুদন্ডকে স্বাগতম জানিয়েছেন। দেশের বাইরে দূরদূরান্তে দরিদ্রতা ও দূর্ভিক্ষের জীবনকে বেছে নিয়েছে" (সাপ্তাহিক আল মিম্বার, লায়ালপুর, ২রা মার্চ ১৯৫২]।

এতদসত্ত্বেও ওদের দূর্ভাগ্য যে, তারা আহমদীয়তকে মেনে নিতে পারেনি। হ্যাঁ তাদের এ ধরনের মন্তব্যে আমাদের বিশ্বাস আরো শক্তি লাভ করে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের ঈমানকে আরো শক্তিশালী করতে থাকুন, বৃদ্ধি করতে থাকুন। আমরা যেন বয়আতের শর্তগুলোকে সানন্দে পূরণ করাকে ফরয মনে করে পূরণ করে যেতে চেষ্টা করতে থাকি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করি।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ইং]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

পর্ব ৪ ঃ অধ্যায় ঃ ১

ওহী-ইলহামের প্রকৃতি

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

একথা বলাই বাহুল্য যে মানুষের সহজাত মনস্তাত্বিক চিন্তা-চেতনা ও ঐশীবাণীর মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তা যারা ঐশী প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা রাখেনা, তাদের নিকট সহজবোধ্য হওয়া কঠিন। কিন্তু যেসব সৌভাগ্যবান ঐশীবাণীর মর্যাদা লাভ করেন, তারা একে আস্থা সহকারেই এক অতীব সুউচ্চ উৎস থেকে প্রেরিত বাণী হিসাবে সনাক্ত করেন (Recognizes it to be a message from on high), কেননা তার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতার সাথে উপরোক্ত বাণীও একেবারেই সম্পর্কিত নয় (Totally unrelated)। কোন কোন সময় এই বাণী নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়-সম্পর্কিত হয়ে থাকে, যার সূচনা সম্পর্কেও সম-সাময়িক কালের মানুষ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হবার পর পরবর্তী যুগের মানুষ অতীত কালের করা কোন ঐশীবাণীর সত্যায়ন করে থাকে (Testifies to the truth of divine revelations of the part)। তাই বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করলেই এটা সহজে প্রতীয়মান হয় যে, কোন্‌টা নিছক মানুষের মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতা, আর কোনটা সত্যিকার ঐশীবাণী।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অতীতে করা কিছু ঐশীবাণীর উল্লেখ করবো যা সেই সময়কার লোকের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগের লোককেও যা সমানভাবে বিস্মিত করেছিল। যেমন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে মিশনের তৎকালীন এক রাজার স্বপ্ন, যার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য রাজার সভাসদবৃন্দ অনুধাবনে অপরাগ হলেও হযরত ইউসুফ (আঃ) ঠিকই এর যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কুরআন শরীফের বর্ণনা মতে জেলে এক মিথ্যা অপবাদের শিকার হিসাবে অন্তরীণ অবস্থায় হযরত ইউসুফকে (আঃ) উক্ত স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। জেলে সাজাপ্রাপ্ত অন্য এক আসামী, যে উক্ত রাজার একজন সেবক ছিল, এবং যার দেখা একটি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা ও ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ) ব্যক্ত করেছিলেন। তাই দন্ড মওকুফ শেষে উক্ত ব্যক্তি যখন রাজার নিকট ফেরত গেল, তখনই রাজার দেখা উক্ত অদ্ভুত স্বপ্ন সম্পর্কে সে অবহিত হয়। তাই সে রাজার অনুমতি নিয়ে জেল খানায় পুনরায় হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করে। রাজার সেই স্বপ্ন ছিল অনেকটা এরূপ; সাতটি সবল সবুজ শস্যের শিস, আর সাতটি চিটাযুক্ত শস্যমঞ্জুরী। আর সাতটি দুর্বল, শীর্ণকায় গরু সাতটি সবল গরুকে খেয়ে ফেলছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বর্ণিত স্বপ্নের তাৎপর্য তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করে বলেন যে, রাজা যে বৎসর উক্ত স্বপ্ন দেখেছেন সে বৎসর থেকে উপর্যুপরি সাত বছর মিশরে উপযুক্ত বৃষ্টি ও সহায়ক আবহায়ার জন্য শস্যের বাম্পার ফলন হবে। কিন্তু এর পরের সাত বছর প্রতিকূল আবহওয়া-জনিত কারণে মিশরে খরা দেখা দিবে ও এতে শস্যহানি ঘটবে। তাই, বাম্পার ফলনের বছরগুলো থেকে যদি কিছু শস্যকে মজুদ করে পরবর্তী বছরের জন্য সঞ্চয় না করে রাখা হয়, তা হলে সাত বছর পর মিশরে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) কৃত এই ব্যাখ্যা রাজা মহোদয়কে এতটাই মুগ্ধ করে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জেলখানা হতে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এই অভিযোগে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে কারাদন্ড দেয়া হয়, তার একটি সুষ্ঠু তদন্ত করে যতক্ষণ প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) জেলখানাতেই অবস্থান করলেন বলে জানান। পরবর্তীতে সুষ্ঠু তদন্ত হলে প্রকৃত অপরাধী (আজিজ মেসের বা পার্টিফারের স্ত্রী, যাকে জোলেখা নামে সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে-অনুবাদক) তার দোষ স্বীকার করে, আর হযরত ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ প্রমাণিত হন, বাদী তাঁকে সসম্মানে জেলখানা হতে মুক্ত করেন ও তার সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে নিয়োগ দেন।

আশ্চর্য হলেও সত্য ঘটনা হলো এই যে, ঠিক যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন, ঠিক সেভাবেই মিশরে ঘটনা পরম্পরা সংঘটিত হয়। আর রাজা প্রথম সাত বছরের বাড়তি ফলন থেকে শস্য মজুদ করে পরবর্তী সাত বছরের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন। এর ফলে শুধু যে মিশরই এক মহা দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা-ই নয়, প্রতিবেশী দেশ ও উপকৃত হয়েছিল, আর এই ঘটনা সূত্রেই পরবর্তীতে ইউসুফ (আঃ) তাঁর হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সার্থক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তাই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর উক্ত স্বপ্ন শুধু একজন মানুষের প্রকৃতিগত, বা অবচেতন মনের চিন্তা-প্রসূত অভিজ্ঞতা ছিলনা, বরং স্রষ্টা কর্তৃক কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে জানানো হয়েছিল (activated by God with a purpose)। অজানা জগতের কোন এলাকা বা অঞ্চল এভাবেই খোদা তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তির নিকট তুলে ধরেন বা স্থানান্তরিত করেন (a portion from the realm of the unseen is transfered to that of the seen)।

বিষয়টিকে শেষ করার পূর্বে শয়তানী স্বপ্ন বা ইলহামের ব্যাপারে কোরআনের শিক্ষা-সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, যদিও এর সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করছি। কোরআন শরীফের সূরা আশ্ শোয়ারার ২২২ থেকে ২২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো যে কার উপর শয়তান নাজেল হয়? তারা নাযেল হয় প্রত্যেক পাপাচারী ও মিথ্যাবাদীর উপর, আর তারা কান পেতে থাকে (শয়তানী বাণী ও কার্যক্রমের জন্যে) বস্তুত তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী"।

কুরআনের এই শিক্ষা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, সত্যিকার ঐশীবাণী লাভ বা তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও পাপাচারী ও মিথ্যাবাদী লোক তাদের ধারণামতে, এক ধরনের মিথ্যা ওহী লাভ করে থাকে। প্রত্যেক মানুষকে তাই ওহী-ইলহামের সত্যতার জন্য অতি সতর্কতার সাথে দাবীকারকের সত্যতা ও বাণীর যুক্তিকতাকে যাচাই করে দেখা দরকার। শেষ কথা তাই এই যে. সত্য ও মিথ্যা ওহী দুটোর সম্ভাবনাই আছে। হ্যাঁ, যারা মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী, তারা মিথ্যা স্বপ্ন ও মিথ্যা ওহীর দাবীদারও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সত্য স্বপ্ন ও ঐশীবাণীর সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও মাপকাঠি হচ্ছে তাই ওহী লাভকারীর সত্যতা বা মিথ্যাচারিতা।

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ- অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

পবিত্র নবী-সহধর্মিণীগণ (রাঃ)

মূল ঃ মোকাররম হাদী আলী চৌধুরী সাহেব

হযরত খদীজা (রাঃ)

হযরত খদীজা ছিলেন সন্তানধারী এক বিধবা নারী। তাঁর এক এক করে দুই স্বামী মারা যায়। তিনি খুবই সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য, ভদ্র ও পুণ্যবতী ছিলেন। এ কারণে তিনি তাহেরা নামে খ্যাত ছিলেন (যুরকানী)।

তাঁর পবিত্র গুণাবলীর কারণে মক্কার কোন কোন লোক তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি সবাইকে অস্বীকার করেন। এ দিকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের যৌবনকাল থেকেই সত্যাবাদী ও বিশ্বস্ত বলে খ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এ সমাজে এ দু'টি সত্তা ছিলেন যাঁদেরকে এমন বিরল গুণাবলীর অধিকারী বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো যেন একই চরিত্র ও গুণের একটি জোড়াবিশেষ। অতএব যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর যোগাযোগ হলো আর তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র ও যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত হলেন এবং তাঁর দাস মায়সারাকে তাঁর (সঃ) প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখলেন তখন তিনি স্বয়ং বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ তালেবের সাথে পরামর্শক্রমে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সুতরাং তাঁর (সঃ) আত্মীয়স্বজন ও হযরত খদীজার নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজন একত্র হলে হযরত আবূ তালেব ৫০০ দিরহাম মহরানা ধার্যে হযরত খদীজার (রাঃ) সাথে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিয়ের ঘোষণা দেন। এ সময়ে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বয়স ২৫ বছর ও হযরত খদীজা (রাঃ)-এর বয়স ৪০ বছর (ইবনে সা'দ, প্রথম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)।

এ বিয়ে হয়েছিল ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে। হযরত খাদীজা সেই ব্যক্তিত্ব যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এদিক থেকে সকল পুরুষ ও নারীর ওপরে তাঁর প্রাধান্য রয়েছে। নবুওয়তের দাবীর ১০ম বছরের রমযান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং মক্কার প্রাচীন কবরস্থান 'জান্নাতে মুআল্লাতে' তিনি সমাহিত হন।

হযরত সাওদা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)

হযরত খদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মনে শীঘ্র অন্য বিয়ের ধারণা আসা তাঁর (সঃ) নবুওয়তের দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিলো। যদিও তিনি (সঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি যেন তাঁর পথ-প্রদর্শক হন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর (সঃ) দোয়া শোনেন আর তাঁকে এক স্বপ্নের মাধ্যমে তার (স্ত্রী) নির্বাচনের সংবাদ দেন। তাই হাদীসে এসেছে, সেসব দিনে নবী করীম (সঃ) একটি স্বপ্নে দেখেন, জিব্রাইল (আঃ) তাঁর (সঃ) সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর সামনে একটি সবুজ রং-এর রেশমী রুমাল উপস্থাপন করে বলেন, 'ইনি পৃথিবী ও আখেরাতে আপনার স্ত্রী।' তিনি রুমালটি নিয়ে দেখেন। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বিনতে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ছবি ছিলো (তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, ফতহুল বারী, শরাহ্ সহী বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

এর কিছুদিন পরে উসমান (রাঃ) বিন মাযউন এর স্ত্রী খওলাহ্ (রাঃ) বিনতে হাকীম তাঁর (সঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আপনি বিয়ে করছেন না কেন? তিনি (সঃ) বল্লেন, 'কাকে?' খওলাহ্ (রাঃ) বল্লেন, আপনার প্রিয় বন্ধু আবূবকর সিদ্দীকের কুমারী কন্যা আর আপনার খাদেম সুকরান বিন আমরের বিধবা সাউদা বিনতে যামআ তো রয়েছে।' আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, 'বেশ তো, তুমি এদের উভয়ের ব্যাপারে আলাপ কর না?' সুতরাং খওলাহ্ (রাঃ) প্রথম আবূ বকর (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী উম্মি রুমানের সাথে কথা বলেন। তাদেরকে প্রস্তাব দেয়ার পরে খওলাহ্ (রাঃ) হযরত সাউদা বিনতে যামআর নিকট গেলেন। তিনি ও তাঁর আত্মীয়রা মত দিলেন। তাই ১০ নবুবী সনের শওয়াল (মে-জুন ৬১৯ খৃষ্টাব্দ) মাসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এঁদের উভয়কে জন প্রতি ৪০০ দেরহাম মোহরানা ধার্যে বিয়ে করেন। আর হযরত সাউদা (রাঃ)-এর বিয়ের সাথে সাথেই রুখসতানাও সম্পন্ন হয়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স যেহেতু কম ছিলো তাই তাঁর রুখসতনা হিজরতের পর পর্যন্ত স্থগিত থাকে (যুরকানী, আসাদুল গাবাহ্)। পরে প্রায় ৫ বছর পরে ৩য় হিজরীর শওয়াল মাসে (মার্চ-এপ্রিল ৬২৪ খৃষ্টাব্দ) তাঁর রুখসতনা সম্পন্ন হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত সাউদা (রাঃ)-এর বিয়ে ১০ নবুবী সনের শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আর সাধারণ বর্ণনানুসারে হযরত সাউদা (রাঃ)-এর বিয়ের অনুষ্ঠান হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিয়ের কয়েকদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বয়স ৫০ বছরের ওপরে [সীরাত খাতামান্নাবীঈন; হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ)]।

হযরত সাউদা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারী প্রাথমিক কালের মু'মিন মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর প্রথম স্বামী হযরত সুকরান (রাঃ) এরও আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তিনি তাঁর স্বামী হযরত সুকরান (রাঃ)-এর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হযরত সুকরান (রাঃ) সেখানে ইনতিকাল করেন। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসার পরে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। অনেক বয়স হওয়ার কারণে বিয়ের কিছুদিন পরে তিনি (রাঃ) তাঁর পালা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পক্ষে প্রত্যাহার করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ হয় তাঁর। তিনি (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর (সঃ) বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ৫টি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)

হযরত আয়েশাকে খোদাতাআলা উন্নত মার্গের ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার বল্লেন, পুরুষদের অনেক কামেল লোক চলে গেছেন কিন্তু মেয়েদের মাঝে

কামেল লোক খুবই কম হয়ে থাকে। আবার তিনি ফেরআওনের স্ত্রী আসিয়া ও মরিয়ম বিনতে ইমরানেরও উল্লেখ করেন। আর পরে আয়েশার মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বল্লেন, মেয়েদের মাঝে তোমার (রাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছে যেমন খাবারের মাঝে সারীদ-এর বেলায় হয়ে থাকে (বুখারী কিতাবুল মনাকিব)। তিনি (রাঃ) উহুদ ও বনী মুস্তালিক-এর যুদ্ধে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলেন। উহুদ-এর যুদ্ধে তিনি (রাঃ) নিজ কাঁধে পানির মশক উঠিয়ে আনতেন এবং আহতদের পান করাতেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে তাঁর (রাঃ) হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) কমপক্ষে ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন এবং ৫৮ হিজরী সনের রমযান মাসে স্বীয় প্রকৃত প্রেমিকের সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনি মদীনায় 'জান্নাতুল বাকী'তে সমাহিত হয়েছেন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৮ বছর। তাঁর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দু'হাজার থেকে অধিক।

হযরত হাফসা (রাঃ)

হযরত খুনায়েস বিন হুযায়েফা (রাঃ) নামক একজন নিষ্ঠাবান সাহাবীর স্ত্রী ছিলেন হযরত হাফসা (রাঃ)। খুনায়েস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের পরে তিনি মদীনায় ফিরে এসে রোগাক্রান্ত হন এবং এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেননি (আল্ আসাবাহ্ ও যুরকানী)।

তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন পরে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের চেষ্টায় তৎপর হন। এ সময় হাফসার বয়স ছিলো ২০ বছরের কিছু ওপরে (আল্ আসাবা ও যুরকানী)। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ের কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু হযরত আবূবকর (রাঃ) এ বিয়েতে সম্মতি দেন নি। তখন তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে আলাপ করেন। কিন্তু তিনিও হাফসাকে বিয়ে করার অপারগতা প্রকাশ করলেন। এদের উভয়ের অস্বীকারের পরে হযরত উমর (রাঃ)-এর মন খারাপ হলো। হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর অস্বীকার করার কারণ ছিলো এই যে, তিনি (রাঃ) আগেই আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে হাফসার বিয়ের কথা বলেছিলেন। তাই আঁ হযরত (সঃ) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট হাফসা (রাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি খুবই আনন্দের সাথে এ প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ, আর ৩য় হিযরীর শাবান মাসে (ফেব্রুয়ারী ৬২৫ খৃষ্টাব্দ) হযরত হাফসা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নবী সহধর্মীণীদের অন্তর্ভুক্ত হন (তাবারী)।

হযরত হাফসা (রাঃ)-এর বয়স বিয়ের সময় প্রায় ২১ বছর ছিল আর এ কারণে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পরে সাহাবাগণের মাঝে উত্তম ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। তিনি পবিত্র সহধর্মিণীদের মাঝে তাঁর এক বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে তার অনেক ঘনিষ্ঠতা ছিলো। কেবল কোন কোন সময়ে ঈর্ষা ছাড়া যা কিনা এ ধরনের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তারা খুব সুসম্পর্কের সাথে বসবাস করতেন। হযরত হাফসা (রাঃ) লেখাপড়া জানতেন। তিনি শিফায়া বিনতে আব্দুল্লাহ্ নামক এক সাহাবীয়ার নিকট লেখাপড়া শিখেন (আবূ দাউদ, কিতাবুত্ত্বিব)। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে তাঁর হজ্জের সৌভাগ্য হয়েছিলো। ৪৫ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৬৩ বছর ছিলো। হাদীসের কিতাবে তার বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ৬০।

হযরত যয়নাব (রাঃ)

হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মার প্রথম বিয়ে হয়েছিলো তোফায়েলের সাথে। আর দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিলো ওবায়দার সাথে। এরা উভয়েই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাচা হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। তাঁর তৃতীয় বিয়ে হয়েছিলো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এক ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের সাথে। এ ছিলো তাঁর (সঃ) পবিত্র স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের ভাই। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আর তাঁর (রাঃ) যয়নাব বিনতে খুযায়মা বিধবা অবস্থায় নিরাশ্রয় হয়ে গেলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর পক্ষ থেকে যয়নাব বিনতে খুযায়মাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। আর তাঁর পক্ষ থেকে সম্মতি পাওয়ার পর ৪ হিজরী সনের সফর (জুলাই ৬২৫ খৃষ্টাব্দ) বিয়ে করেন। এ সময়ে হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মার বয়স ছিল ৩০ বছরের কাছাকাছি। এ বিয়ের পর কয়েকটি মাসও কাটেনি ৪ হিজরীর রবিউল আওওয়াল মাস তিনি (রাঃ) ইন্তিকাল করেন আর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাকে 'জান্নাতুল বাকী'তে সমাহিত করেন। গরীবদের প্রতিপালন করার জন্যে তিনি উম্মুল মাসাকীন (গরীবদের মা) নামে খ্যাত ছিলেন (যুরকানী, ৩ খন্ড, আসাবাহ্ ফী মা'রিফাউস সাহাবা)। হযরত যয়নাব (রাঃ) বিনতে খুযায়মা মায়ের দিক থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত ময়মুনা (রাঃ)-এর বোন। (চলবে)

(দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া-এর ৩০-১০-২০০৩ তারিখের সংখ্যা সৌজন্যে)।

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

অমৃতবাণী (৩য় পাতার পর)

অনুসারে, হযরত উসমান (রাঃ) নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে এবং সমস্ত সাহাবা (রাঃ) স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে ধন-প্রাণসহ আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্যে আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর এখন লোকে বয়াত তো করে যায় এবং এ প্রতিজ্ঞাও করে যে, ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপরে প্রাধান্য দিবে কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সময় শক্ত করে পকেট ধরে রাখে। ভাল, এরূপ পার্থিব আসক্তি দ্বারা কি কেউ ধর্মীয় অভীষ্ট লাভ করতে পারে? এবং এরূপ লোকের অস্তিত্ব কি কোন প্রকারে লাভজনক হতে পারে? কখনও নয়, কখনও নয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন -লানতানালুল বির্‌রা হাত্তাতুনফিকূ মিম্মাতুহিব্বুন অর্থাৎ যে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো মহিয়ান আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যয় না কর সে পর্যন্ত তোমরা পুণ্য লাভ করতে পার না। সুতরাং যারা উপস্থিত আছ বা অনুপস্থিত আছ তোমাদের প্রত্যেককে আমি তাগিদ করছি, তোমাদের ভাইদেরকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করে দিবে এবং প্রত্যেক দুর্বল ভাইকেও চাঁদায় শরীক করবে। এ সুযোগ আর আসবে না। এ যুগ এরূপ আশীষপূর্ণ যে, কারও প্রাণ চাওয়া হয় না এবং এ যুগ প্রাণ দিবার নয় বরং এটা শক্তি অনুসারে অর্থ ব্যয় করার যুগ।"

(আল্ হাকাম পত্রিকা ৭ম খন্ড, ১৫ জুলাই তারিখে প্রকাশিত, ২৫)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবাদের মর্যাদা

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে ২য় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আবহাওয়া বদলের জন্য ডাল হাউজী যান। ২৩ আগষ্ট তারিখের মাগরিবের নামাযের পর কথায় কথায় তিনি বলেন, "লোকেরা কিভাবে জানবে হাফেয মঈন উদ্দিন (মরহুম), হাফেয হামদ আলি (মরহুম) বাবা রোড়া (মরহুম), পৃথিবীর জন্য বা আমাদের সিলসিলার জন্য কি কাজ করেছেন? তা পৃথিবীর লোকদের অজানা। খবরের কাগজে এর কোন উল্লেখ নেই। হযরত আবু হুরায়রা বা হযরত হাসান এ সময়ের হলে তাদেরও অবস্থা এরূপ হত।

হাফেয মঈন উদ্দিন মরহুম সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি দুধ নিতে যেতেন। কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত আছে জানলে তিনি নিজের দুধ তাকে দিয়ে এসে ঘরে শুয়ে থাকতেন। বাবা রোড়া মরহুম সম্পর্কে হযরত খলীফা সানী (রাঃ) বলেন, "মরহুম– মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রাথমিক অবস্থার বিশ্বস্তদের একজন। বয়াতের পূর্ব থেকে তাঁর সাথে হযরত সাহেবের ভালবাসা ছিল। অনেকবার তিনি বয়াতের জন্য হযরত সাহেবকে বলেন, হুযূর (আঃ) বলতেন, "খোদার তরফ থেকে আদেশ হলে বয়আত নেব", বাবা মরহুম তাঁকে সবার আগে বয়আত নেয়ার জন্য নিবেদন করেন। সময় এলে হযরত সাহেব তাঁকে চিঠি লিখেন, "আমি লুধিয়ানাতে যাচ্ছি। কিছু নেক কাজের জন্য ওখানে বয়আত নেয়া হবে। তুমি চলে এস"। এ খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর অফিসারের কাছে অফিসের কাগজপত্র জমা দিয়ে বলেন, "যদি ছুটি পাওয়া যায় ভাল, না হলে আমি অবশ্যই যাব।" ওখান থেকে লুধিয়ানাতে এসে তিনি ৫ কিম্বা ৬ নম্বরে বয়আত করেন।

তিনি হযরত সাহেবের কাছে প্রায়শ কুপুর থলাতে যাওয়ার জন্য নিবেদন করতেন। একবার হুযূর কাউকে না জানিয়ে কপুর থলা রওনা হন। হুযূর (আঃ) এর সাথে এক্কাতে এক ঘোর বিরোধী লোক ছিল। তিনি বাবা রোড়াকে গিয়ে বলেন, তোমার মির্যা এসে গেছে। কিন্তু মরহুম বাবার তাতে বিশ্বাস হল না যে এরূপ মহান ব্যক্তি কিরূপে কপুরথলাতে আসতে পারেন। কিন্তু ভালবাসা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল যে বোধ হয় হযরত সাহেব এসেছেন। তিনি সে বিরোধীকে কঠিন কঠিন গালি দেওয়া শুরু করেন যে তুমি মিথ্যা বলছ। আর সম্ভবত তিনি আসছেন ভেবে খালি মাথায় খালি পায়ে দৌড়ানো শুরু করেন। কিছু দূর গিয়েই তিনি থেমে আবার গালি দিতে শুরু করেন। কিন্তু ভালবাসা তাঁকে টানতে থাকে; আর তিনি এক্কা খানার দিকে রওনা হন। যতক্ষণ এ বিরোধী তাঁর সামনে ছিল তিনি এরূপ করতে থাকেন। শেষে তিনি দেখেন যে হযরত মসীহ্ মাওউদ সামনের দিক দিয়ে আসছেন। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

হযরত খলীফা সানী (রাঃ) বলেন, "একবার সম্ভবত মৃত্যুর দুবছর আগে বাবা রোড খান (অড়োড়া খান সাহেব) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি চিকিৎসা করাতে অস্বীকার করতে থাকেন। অনেকে তাঁকে বুঝান তিনি তা না শুনে বলতে থাকেন "অনেক দিন অপেক্ষার পরে এ অসুখ এসেছে, এখন আমাকে যেতে দাও। যেভাবে আমার প্রিয় চলে গেছেন।"

আমি খবর পেয়ে তাঁকে জবরদস্তি চিকিৎসা করাই। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "মিয়া মুহাম্মদ খান সাহেব পুরাতন বিশ্বস্তদের মধ্যে একজন। তাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল "এ সকল লোক কেয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে"। হযরত খলীফা আউয়াল (রাঃ) বলেন, "এক ব্যক্তিই আমাকে পরাজিত করেছেন। আর তিনি হলেন মিয়া মুহাম্মদ খান সাহেব। প্রথম বশীরের মৃত্যুর পর লোকজন হযরত সাহেবকে অনেক চিঠি লিখেন। মৌলভী সাহেব (খলীফা আউয়াল) লেখেন, যদি এ সময় আমার নিজের ছেলে মারা যেত তবুও আমি কিছু মনে করতাম না, যদি প্রথম বশিরের মৃত্যু না হত। আর লোকেরা এ সন্দেহ থেকে বেঁচে যেত। তিনি আরও লেখেন যে এরূপ যদি কোন চিঠি আসে তা যেন তাকে জানানো হয়"। হযরত সাহেব মৌলভী সাহেবকে ২টি চিঠি পাঠান। এর মধ্যে একটি ছিল মিয়া মুহাম্মদ খান সাহেবের। তিনি লেখেন, যদি আমার এক হাজার ছেলে থাকত। আর আমার সামনে সকলকে কতল করা হত। এতে আমি আফসোস করতাম না। যদি বশিরের মৃত্যুতে লোকদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি না হত। মৌলভী সাহেব বলতেন, আমি এ চিঠি পড়ে খুব লজ্জিত হই।

তিনি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে আমাদের অনেকেই জামাতের মূলনীতিকে বুঝেনি। সাহাবারা বুঝেছিলেন। সূর্যকে তার উপগ্রহের সাথে ভাল লাগে। চাঁদের মর্যাদা তার আশপাশের প্রদক্ষিণরত তারার সাথে প্রকাশ পায়। এভাবে প্রদীপ পতঙ্গের সাথে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে আমরা যতই প্রশংসা করি না কেন জনগণ একে অতিরঞ্জিত মনে করবে। কিন্তু তাঁর সেবকদের অবস্থা শোনালে এবং তাদের সাথে হুযূরের কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা জানালে, তাদের স্বভাবত মনে হবে এটা মিথ্যা হতে পারে না, এর মধ্যে অবশ্যই কোন সত্য আছে।

তিনি (হযরত খলীফা সানি) (রাঃ) বলেন, "একবার কোন লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর আপত্তি করে। আমি তাকে বলি তুমি তো ২/১টা ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর আপত্তি করছ। যদি সকল ভবিষ্যদ্বাণী বাহ্যিকভাবে মিথ্যা মনে হয় তবুও আমরা তোমার কথা শুনবো না। যে নিজের চোখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে দেখেছে আর ওই বস্তু পেয়েছে যা তিনি খুঁজছিলেন। তাকে হাজার দলীল দিলেও তিনি তা মানবেন না। তিনি তো বলবেন, আমি তাঁর (আঃ)-এর চোখে ঐ জ্যোতি দেখেছি যা আমাদের হৃদয় থেকে কখনও বার হতে পারে না। আর আমরা তাঁর (আঃ) থেকে দূরে যেতে পারি না।

সৌজন্যে ঃ আলফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪

অনুবাদ - কওসার আলী মোল্লা

তাহ্‌রীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান রাবওয়াহ্'র দপ্তর থেকে –

ওয়াকফে নও সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা

আমীর সাহেব
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রিয় আমীর সাহেব,

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) গত ১৮ই জুন, ২০০৪ তারিখে জুমুআর খুতবায় কুরআনের দোয়া রাব্বি জিদনী ইলমান' (হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞানকে তুমি বাড়িয়ে দাও) এই দোয়ার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই উক্ত দোয়ার উপর ভিত্তি করে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং সেই লব্ধ জ্ঞানকে অন্যের নিকট ছড়িয়ে দিতে হবে। হযরত (সঃ) বলেছেন যে, "জ্ঞানার্জনের জন্য যে সমস্ত জ্ঞানীদের সম্মেলন হয়ে থাকে তা স্বর্গীয় বাগানস্বরূপ এবং জ্ঞানান্বেষনের জন্য বের হওয়া লোকগণের পথকে ফেরেস্তাগণ তাদের পাখা দিয়ে ছায়া দিয়ে থাকেন"। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরো বলেন যে, "একজন জ্ঞান অর্জনকারী লোক এবং একজন এবাদতকারীর তুলনা একগুচ্ছ তারকারাজির মধ্যে চাঁদের অবস্থানের ন্যায়"।

হুযূর আইয়েদাহুল্লাহু তায়ালা বেনাসরিহিল আজিজ জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে নও, তাদের মাতাপিতা এবং ওয়াকফে নও বিভাগের উদ্দেশ্যে জোর দিয়ে বলেন যে–

১। সকল ওয়াকফে নও বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে উচিত হবে যেন তারা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। এমনকি তাদেরকে এমন দক্ষতা অর্জন করতে হবে যেন তারা জামাতের কিতাবাদি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতে পারে।

২। হুযূর (আইঃ) ঘানার জনৈক খৃষ্টান ধর্ম যাজকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করত বলেন যে ঐ যাজক দূরবর্তী এক উপজাতীয় লোকদের নিকট প্রত্যেক দিন এই জন্য যাওয়া আসা করতেন যেন তিনি তাদের ভাষা শিখতে পারেন এবং বাইবেলকে ঐ ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন।

৩। প্রত্যেক দেশের "ওয়াকফে নও" বিভাগের উচিত তারা যেন ওয়াকফে নওগণের মধ্যে যারা বিভিন্ন ভাষা শিখছেন তাদের ১টি তালিকা প্রস্তুত করেন।

৪। জামাতে আহমদীয়ায় নিম্নবর্ণিত কর্মশালার জন্য কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন। ওয়াকফে নও বিভাগের উচিত তারা যেন এ সমস্ত কাজে আগ্রহী লোকদের তালিকা প্রস্তুত করেন; (১) প্রচারক (২) ডাক্তার (৩) শিক্ষক (৪) প্রকৌশলী (৫) আইনবিদ (৬) কম্পিউটার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ।

৫। কতক ওয়াকফে নও বৈমানিক, ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলোয়ার ইত্যাদি হতে চায় কিন্তু এ সমস্ত জিনিস ওয়াকফের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৬। ওয়াকফে নওকে সঠিক পরামর্শ দিতে হবে যাতে তারা যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে ভবিষ্যতে তাদেরকে কি হতে হবে। এ কাজটি ওয়াকফে নও বিভাগ এবং পিতামাতা উভয়ের দায়িত্বের অন্তর্গত।

৭। ওয়াকফে নওয়ের তালিকা হতে জামাত সঠিকভাবে জানতে পারবে যে কোন্ কোন্ দেশে কতজন প্রচারক, শিক্ষক, প্রকৌশলী ও আইনজ্ঞ আছেন।

৮। এ ধরনের তালিকায় প্রত্যেক বৎসর নবাগত ওয়াকফে নও এবং যদি কেউ ওয়াকফে নওয়ের তালিকা হতে বহির্ভূত হয়ে যায় তাদের তালিকাও প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

৯। প্রত্যেক শিশুর বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে যেমন সে কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত, কোন্ পেশা তার জন্য উপযুক্ত এবং সে কি ধরনের কাজ করতে পারে।

১০। ১৫ বৎসরের অধিক ওয়াকফে নওগণের উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করে মরকযে পাঠাতে হবে। এ সমস্ত তথ্যাবলী এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যেন জামাত ওয়াকফে নওয়ের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে জানতে পারে।

হুযূর (আইঃ) আরো বলেন– "প্রতিটি দেশেই ওয়াকফে নওয়ের সংগঠনগুলোকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন যে তার বিশ্বাসীগণ জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আমাদেরকে এই পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদি আমরা এরূপ করি তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার করুণা আমাদের সারথি হবে। আমাদের সন্তানগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। স্বল্প সংখ্যক ছেলেমেয়ে এমনও আছে যারা তাদের জীবনের লক্ষ্যস্থলকে নিজেরাই সঠিকভাবে নির্ধারণ করে নিতে পারে কারণ এ ব্যাপারে তারা সজাগ আছে কিন্তু অধিকাংশ শিশুকেই পরিচালনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের গভীরতায় গিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

হুযূর (আইঃ) তাঁর খুতবা নিম্নবর্ণিত দোয়া দ্বারা শেষ করেন; "আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানার্জনে সাহায্য করুন এবং লব্ধ জ্ঞানকে আমাদের পরবর্তী বংশধরগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন"। জাযাকুমুল্লাহ্।

ওয়াস্‌সালাম
স্বাক্ষরিত
চৌধুরী হামিদুল্লাহ্
ওকীলে আ'লা
তাহ্‌রীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রাবওয়াহ্।
তাং - ২৪ জুন, ২০০৪ইং।

আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪র্থ বাহাস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে মরহুম মুন্সী গোলাম সরওয়ার সাহেবের বাংলা ঘরের সামনে। আহমদীগণের পক্ষে মোনাজের ছিলেন নিখিল ভারতের সাইকেল ভ্রমণকারী আহমদীয়তের মোবাল্লেগ কুরায়েশী মোহাম্মদ হানিফ সাহেব। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব, সভাপতি ছিলেন তারুয়ার কৃতি সন্তান এডভোকেট মৌঃ আঃ রউফ সাহেব। উভয়ে উর্দূ ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। আহমদী পক্ষের অনুবাদক ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব। অপর পক্ষে অনুবাদক ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার অন্য একজন মৌলানা। এই বাহাসে কাহাকেও কোন সময় বাধিয়া দেয়া হয় নাই। প্রশ্নের উত্তর দিতে যাহার যতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন ততক্ষণই বলিবেন। বাহাস ৭/৮ ঘন্টা স্থায়ী ছিল। এই এলাকার বহু লোক শামিল ছিল ও অতি মনোযোগে উভয়পক্ষের কুরআন হাদীস ও যুক্তি তর্ক উপভোগ করিতে ছিলেন। এক পর্যায়ে আহমদী মুনাজের হানিফ সাহেব হাদীস হইতে ১টি দলিল পেশ করিলে অ-আহমদীগণ এই দলিল হাদীসে নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে কুরায়েশী সাহেব বলিলেন, আপনাদের কিতাব সমূহের মধ্যে হাদীসের কিতাবখানা আমাকে দিন আমি এই হাদীস ইনশাআল্লাহ্ দেখাইয়া দিব। তাহারা ঐ হাদীসের কিতাব তাহাকে দিতে অস্বীকার করিলে কুরায়েশী সাহেব তাহার নিজ আসন ছাড়িয়া মৌলানা সাহেবগণের নিকট আসিয়া ঐ কিতাব হাতে নিয়া ঐ হাদীসখানা তাহাদিগকে দেখাইয়া ও তরজমাসহ পড়াইয়া শুনাইলেন। সভার ওলামাগণ হতভম্ব হইয়া গেলেন।

পুনরায় উভয়পক্ষের প্রশ্ন-উত্তর চলিতেছিল এই সময় অতিরিক্ত গরম উপশমের জন্য সভাপতির বাড়ি হইতে ডাবের পানি পান করান হইল। উভয়পক্ষের মুনাজেরগণের মধ্যে আরও অনেকে পান করিলেন। কুরায়েশী সাহেব ডাবের পানি পান করার ফলে হঠাৎ করিয়া তাহার গলার আওয়াজ বসিয়া গেল। সভাপতি সাহেব সভার কাজ মুলতবী ঘোষণা করিলে অপরপক্ষের ওলামাগণ গোলমাল করিতেছিল। বাড়ির মালিক মুন্সী গোলাম সরওয়ার সাহেব তার ভিতর বাড়ির ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার বাড়িতে গোলমাল করিতে পারিবে না বলিয়া উচ্চস্বরে হাক ডাক দিলে গোলমাল থামিয়া গেল। তখন তিনি তাহার ছেলে সভাপতি এডভোকেট সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন মৌলানাগণ যখন কুরায়েশী সাহেবের দলিল হাদীসে নাই বলিয়া অস্বীকার করিলেন তখনই কুরায়েশই সাহেব তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া তাহাদের টেবিল হইতে তাহাদের বই থেকে দলিল দেখাইয়া দিলেন যখন তাহারা এই দলিল অস্বীকার করিতে পারিলেন না তখনই মুনাজারা বন্ধ করা উচিত ছিল। তাহার এই কঠোর মন্তব্য শুনিয়া মৌলানাগণ চুপ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অপর পক্ষ হইতে কেহ বলিলেন গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই বুঝা গেল তাহারা হারিয়া গেছে। কোন দলিলে কোন প্রশ্নে হারিয়াছে বলিতে না পারিলে গলার স্বর বন্ধ হইয়া যাওয়া হারিয়া যাওয়ার লক্ষণ হইতে পারে না। তিনি আরো বলিতে লাগিলেন কয়েক ঘন্টা আমরা উভয় পক্ষের বাহাস শুনিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে কুরায়েশী সাহেবকে কেহ কোন কথায় আটক করিতে পারে নাই বরং অ আহমদী মৌলানা যে হাদীস অস্বীকার করিয়া সত্যকে চাপা দিতে চাহিয়াছিল, সেই হাদীস তাহাদের নিকটে যাইয়া তাহাদের সম্মুখে পেশ করিয়াছে এবং হাদীস সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। অ-আহমদী মৌলানাগণ নিরুত্তর হইলেন।

ইহার পরও এই বাহাস সম্বন্ধে আহমদীগণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তারুয়ার সমঝদার নিরপেক্ষ লোকগণ তাহার জোড়ালো প্রতিবাদ করিতেন। তারুয়ার অনেক লোক যাহারা আহমদীয়ত সম্বন্ধে অবগত হইয়াছে তাহারা ভিন্ন গ্রামে গেলে কেউ আহমদীয়তের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাহারা তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। এই জন্য এলাকার লোকেরা বলিয়া থাকে তারুয়ার সকলেই কাদিয়ানী হইয়া গিয়াছে।

এই এলাকায় তখন হিন্দু ছিল। তারুয়ার হিন্দুগণ ও অন্যান্য গ্রাম হইতে শিক্ষিত হিন্দুগণ আমাদের জলসায় যোগদান করিতেন। আহমদীয়তের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইতেন। আহমদীগণকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বাহাসে আমার অ-আহমদী ছোট ভাই প্রফেসর মোহাম্মদ আলী এম. এ. উপস্থিত ছিলেন ও উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। 'আহমদী' পত্রিকায় একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং এই বাহাসে এডভোকেট আঃ রউফ সাহেবের গোলাম সামদানী সাহেবের উর্দূ হইতে বাংলা তরজমার খুবই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

খাকসার ও মরহুম মৌঃ সামসুজ্জামান তারুয়া এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যাইয়া হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে তবলীগ করিতে থাকিলে অ-আহমদী ও হিন্দুগণের মধ্যে পবিত্র জামাত সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকিলে তারুয়াতে প্রথম সালানা জলসায় অনেক হিন্দু ও অ-আহমদী যোগদান করিয়াছিলেন। এই জলসা ১৯৩৩ সনের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় কিছু লোক বয়আত করিয়াছিল। শ্রোতাগণের পক্ষ হইতে এইরূপ আরও সমাবেশ হওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই জলসার সুবক্তাগণের মধ্যে ছিলেন জনাব মৌঃ সৈয়দ ছাইদ আহমদ সাহেব, মৌঃ গোলাম ছামদানী খাদেম সাহেব, মৌঃ আজিজ উদ্দিন সাহেব, উকিল মোঃ আউসাফ আলী সাহেব প্রমুখ। এই জলসা এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেকের বাড়ি হইতে এই জলসায় চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই জলসায় খরচ হইয়াছিল মোট ১৩ (তের) টাকা ৫ (পাঁচ) আনা। ইহার পর হইতে তারুয়াতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, ইনশাআল্লাহ্। (চলিবে)

- ডাঃ আহমদ আলী

"সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এই কবর স্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে"

'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তক থেকে পর্যালোচনা

আল্ ওসীয়্যত পুস্তকটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আল্ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদাতাআলার বিশেষ ইলহামের আলোকে (১৯০৫-১৯০৬) রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া এর বাংলা অনুবাদ করে প্রথম প্রকাশ করেন। মরহুম মৌলভী এ, এইচ, এম আলী আনোয়ার সাহেব পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ করেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর এমন কোন পুস্তক নাই যেখান হতে লোকেরা খোদার প্রকৃত বান্দা হওয়ার কৌশল খুঁজে না পায়। প্রতিটি পুস্তকে ঐশী দিক নির্দেশনায় ভরপুর। তেমনি আল্ ওসীয়্যত একটি অনন্য পুস্তক। এই পুস্তকটি তিনি মহান খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়ে রচনা করেন। তিনি নিজ থেকে এটি রচনা করেন নি, খোদার আদেশেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) পুস্তকটি লেখেন। এই পুস্তকে তিনি জামাতের সেই সব মুখলেস ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা প্রকৃতার্থে দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তাদেরকে নেযামে ওসীয়্যতে দাখেল হবার আহ্বান জানিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন, "যারা ওসীয়্যত করে নাই তাদের ইমান সম্বন্ধে সন্দেহ আছে"। এই কিতাব সম্বন্ধে এক কথায় শেষ করতে হ'লে বলা যায় হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর ওফাতের অব্যবহিত পূর্বে ঐশী ইলহামের মাধ্যমে "ওসীয়্যত" সংক্রান্ত যে সব নির্দেশনাবলী প্রাপ্ত হন তা তাঁর রচিত কিতাব "আল্-ওসীয়্যত"।

ওসীয়্যত মানে উইল। যারা ওসীয়্যত করেন তাদের বলা হয় মুসী। সৎ ও নিষ্ঠাবান আহমদীদেরকে তিনি ওসীয়্যত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। যেসব আহমদী ওসীয়্যত করবেন তারা তাঁদের আয়ের এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে কমপক্ষে এক দশমাংশ ও সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নামে ওসীয়্যত বা উইল করে দিলে তারাই হবেন মুসী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন "আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, এটি তোমার কবরের স্থান হবে। আমি একজন ফেরেশ্তাকে দেখেছি, সে ভূমি জরীপ করছে। তখন সে এক স্থানে উপনীত হয়ে আমাকে বললো, এটি তোমার কবরের স্থান। পুনরায় এক স্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রৌপ্য অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল ছিল। তার মাটি সম্পূর্ণটাই ছিল রৌপ্যের। তখন আমাকে বলা হল, 'এটি তোমার কবর'। আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং তার নাম 'বেহেশ্তী মাকবেরা' রাখা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে, এটি জামাতের সেই সমুদয় মনোনীত ব্যক্তিদের সমাধি ক্ষেত্র, যারা বেহেশ্তী'। তখন হতে সর্বদাই আমার চিন্তা ছিল যে, জামাতের জন্য কবর স্থানের উদ্দেশ্যে এক খন্ড জমি ক্রয় করা হউক। কিন্তু সুবিধাজনক উত্তম জমির মূল্য অধিক হওয়ার কারণে এই উদ্দেশ্যটি বহুদিন পর্যন্ত স্থগিত ছিল। এখন ভ্রাতা মরহুম আব্দুল করীম সাহেবের ওফাতের পর যখন আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও উপর্যুপরি খোদার ওহী হয়েছে, তাই আমি সঙ্গত মনে করি যে, সত্বর কবরস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। এই জন্য আমি আমার বাগানের নিকটবর্তী নিজস্ব মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং আমি দোয়া করছি খোদা যেন এটিতে বরকত দান করেন এবং এটিকেই বেহেশ্তী মাকবেরাতে পরিণত করেন। জামাতের সেই সকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের যেন এটি নিদ্রাস্থান হয় যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মধ্যে এক নেক পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

- আবার আমি দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এই ভূমিখন্ডকে আমার জামাতের সেই পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছে এবং যাদের কার্যকলাপে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নাই। আমীন, ওয়া রাব্বুল আলামীন।

পুনরায়, আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদেরকে এখানে কবরের জায়গা দান কর যাঁরা তোমার এই প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখে এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ না করেন এবং ঈমান ও অনুবর্তীতার দাবীসমূহ পূরণ করে থাকেন। এবং তোমারই জন্যও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছে, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাদের সম্বন্ধে তুমি জান যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছে এবং তোমার প্রেরিত জনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাসের সাথে প্রেম ও মরণপণ সম্পর্ক রাখে, আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

যেহেতু আমি এই কবর স্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি। এবং খোদা এটিকে শুধু বেহেশ্তী মাকবেরাই বলেন নাই বরং এটিও বলেছেন যে **উনযিলা ফিহাকুল্লু রাহমাতান** অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এই কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নাই যাতে এই করবস্থান বাসীদের অংশ নাই" (আল্ ওসীয়্যত পৃঃ ৩১-৩৪)।

এখন চিন্তা করে দেখুন ওসীয়্যতকারীদের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) কত দোয়া করে গেছেন এবং যারা প্রকৃত আদর্শবান তারাই এই দোয়ার শামিল হতে পারবে। যারা ইহ জগতে সৎ তারা পরকালেও আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয় হবেন। দেখুন, আল্লাহ্তাআলা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) নেক বান্দাদের কবরস্থান দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এতে যে খোদার অনুগ্রহ থাকবে তাও বলে দিয়েছেন। ওসীয়্যতের জন্য মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিছু শর্ত রেখেছেন তা আপনারা 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তক পাঠ করে জেনে নিবেন। এবং সকল চেষ্টা করা উচিত। ওসীয়্যতের আওতায় নিজেকে শামিল করা।

আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন "লন্ডনে যখন সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন হুযূর (আইঃ) আমাকে ওসীয়্যতের ওপরে গুরুত্ব দিয়ে মুসীদের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যুগ-ইমামের উপরোক্ত নির্দেশ আপনাদের সামনে পেশ করলাম। যুগ খলীফার আকাঙ্ক্ষার কথাও আপনাদের অবহিত করলাম। এখন সময়ের চাহিদা হলো ওসীয়্যতের গুরুত্ব উপলব্ধি করার। যারা এখনও ওসীয়্যত করেননি তাদেরকে ওসীয়্যক পুস্তকখানা কমপক্ষে ৩ বার পাঠ করে ওসীয়্যত ব্যবস্থার সাথে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে অনুরোধ জানাচ্ছি"। আল্লাহ্তাআলা আমাদের ওসীয়্যত করার তৌফিক দান করুন।

- মাহমুদ আহমদ সমুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রতিবেদন

(৭ম কিস্তি)

১৭তম দিন ৩১ মার্চ, ২০০৪ রোজ বুধবার

হুযূর আনোয়ার DORI-তে মসজিদ বায়তুত্ তাহের এ ফজরের নামায পড়ান। DORI-শহরের আশে-পাশের যেসব বন্ধু অনেক কষ্ট করে হুযূর (আইঃ) কে দর্শনার্থে এসেছিলেন তাঁরা মসজিদে রাত কাটান। এসব বন্ধু হুযূর (আইঃ) এর ইমামতীতে ফজরের নামায আদায় করেন। মহিলাদের জন্যে মসজিদের বাইরে একটি পৃথক স্থানে নামাযের বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। এসব বন্ধু সংখ্যায় ৬০০ থেকে অধিক ছিলেন। তারা এখানে রাত কাটিয়ে ছিলেন। তাদের মুখমন্ডলে খুশী ও আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছিলো। আর তারা বেশি বেশি তাদের প্রিয় নেতার দর্শন লাভ চাচ্ছিলেন।

সকাল ৮-৪৫ মিঃ সময় মিশন হাউজে ডোরী রিজিওনের বিভিন্ন জামাতের সদর ও ইমামদের মুসাফাহার সৌভাগ্য দান করেন। এ উপলক্ষ্যে ছবিও তোলা হয়। ৯টার সময় ডোরী থেকে Kaya-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হয়। রওয়ানা দেয়ার আগে হুযূর দোয়া করান এবং কাফেলা Kaya-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। ডোরী থেকে Kaya-এর দূরত্ব ১৬০ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা। ধূলোবালির কারণে এ সফর খুবই কষ্টকর ছিলো। বেলা ১-৪৫ মিঃ সময় কাফেলা Kaya পৌছে।

সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর গাড়ি কাফেলাকে Escort করে নিয়ে যায়। প্রথম গাড়িতে রিজিওনাল ডাইরেক্টর পুলিশ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় গাড়ি ছিলো সেনাবাহিনীর। এটা কাফেলার শেষে ছিলো। এতে এ এলাকার রিজিওনাল কমান্ডার স্বয়ং ছিলেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়ি সকাল ১০টার সময় পর্যন্ত শহরের ৫ মাইল বাইরে হুযূর আনোয়ারের জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। তাঁরা ৩টা পর্যন্ত হুযূর আনোয়ারের সঙ্গী ছিলেন, শহরে যেখানে যেখানে হুযূর আনোয়ারের গাড়ি যাওয়ার ছিলো সেখানকার সব রাস্তাগুলো পুলিশ ডিউটিতে ছিলো এবং ট্রাফিককে থামিয়ে দিতেন। হুযূর আনোয়ারের Kaya শহরে আসার কিছু আগে শহরের মেয়র সেসব রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার আদেশ দিয়েছিলেন যেসব রাস্তা দিয়ে হুযূর আনোয়ারের গাড়ি যাওয়ার কথা ছিলো।

তিনটার সময় হুযূর Kazande হোটেলে পৌছেন। সেখানে কমিশনার, মেম্বর ন্যাশনাল এসেম্বলী, এ এলাকার সবচেয়ে বড় চীফ এবং ডিভিশনাল ডাইরেক্টরস কৃষি বিজ্ঞান, ডিভিশনাল ডাইরেক্টরস স্বাস্থ্য, শহরের মেয়র ও কমিশনারের সেক্রেটারীরা এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার হুযূর (আইঃ) কে স্বাগত জানান। জামাতের পক্ষ থেকে রিজিওনের মোবাল্লেগ সেলসেলা মোকাররম জাফর আহমদ শাহী সাহেব, সদর জামাত ঈসা সাবাডাগো, রিজিওনাল কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া আর জামাতের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ হুযূর আনোয়ারকে খোশ আমদেদ বলেন। হুযূর আনোয়ার এদের সবাইকে মোসাফাহার সুযোগ দেন। ৪টার সময় হুযূর আনোয়ার মসজিদ হুদা Kaya-তে যুহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। এর সাথেই মসজিদের উদ্বোধনও হয়ে যায়। Kaya ও এর আশ-পাশ থেকে ৪০টি জামাতের আগত এক হাজারেরও অধিক বন্ধু হুযূরের ইমামতীতে নামায আদায় করেন। এছাড়াও ২৭ জন অ-আহমদী গ্রাম থেকে জলসার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। জামাতের বন্ধুরা খুবই আনন্দিত ছিলেন। হুযূর আনোয়ারের আগমনে খুশী এবং প্রীতিপূর্ণ ধ্বনি উচ্চকিত করছিলেন। মহিলা ও বালিকারা সুন্দর সুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বার বার পড়ছিলো এবং হাত নেড়ে নেড়ে হুযূর (আইঃ) কে খোশ আমদেদ বলছিলেন। তারা সকলেই জীবনে এ প্রথম খলীফা হুযূরকে দেখলেন। সবাই খুশীতে ভরপুর। নামাযের পরে হুযূর আনোয়ার মসজিদ সংলগ্ন স্থানে আহমদীয়া মিশন হাউজের ভিত্তি রাখেন এবং দোয়া করেন। এখানকার জমি হলো ৬৩৩৫ মোরববা মিটার (এক প্রকার জমির মাপ)। এর মালিক হলো জামাতে আহমদীয়া Kaya। এরপরে হুযূর ভাষণ দেয়ার জন্যে মঞ্চে যান। জলসাগাহ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। মসজিদের কাছেই একটি খোলা মাঠে জলসাগাহ্ তৈরী করা হয়েছিলো। এখানে সকাল থেকেই জলসার কর্মসূচী অব্যাহত ছিলো। হুযূর আনোয়ারের ভাষণের মাধ্যমে এটা শেষ হয়।

এক স্থানীয় খাদেম তেলাওয়াতে কুরআন করেন। এরপরে হুযূর ভাষণ দেন। হুযূর আনোয়ার বন্ধুদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা সবাই খুবই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্তাআলা ইমাম মাহ্দীকে সনাক্ত করণে ও গ্রহণ করণে আপনাদেরকে সৌভাগ্য দান করেছেন। বয়আত গ্রহণের ফলে আপনাদের দায়-দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে প্রথম যে উপদেশটি দিতে চাই তাহলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে গুরুত্ব দিন। পুরুষরা মসজিদে এসে বা-জামাতে নামায আদায় করুন। যে বালকের দশ বছরের উপরে বয়স হয়েছে সে-ও মসজিদে এসে বা-জামাত নামায পড়বে। পিতামাতা যদি সন্তানদের সঠিক তরবিয়ত না করে থাকেন এবং নামাযের অভ্যস্ত না বানিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে"।

হুযূর বলেন, প্রত্যেক আহমদী শিশুর একটা অধিকার যে, সে যেন লেখা-পড়া করে। অভাব-অনটনের কারণে যেন কোন শিশু লেখা-পড়া না ছেড়ে দেয়। অর্থনৈতিক কারণে যদি লেখা-পড়ায় বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ্ আপনাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হবে। লেখা-পড়া শিক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের চীন দেশে যেতে হলেও সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করো"। হুযূর বলেন, এর উদ্দেশ্য এই, যে কোন অসুবিধাই হোক না কেন জ্ঞান আহরণ করা অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞান শিক্ষা করে আপনি দেশের সেবা করতে পারেন এবং তবলীগ করতে পারেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক আহমদী সে যেকোন ক্ষেত্রেই থাকুক সত্যতা অবলম্বন করবে আর এতে অন্যদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে। সে যদি ব্যবসায়ী হয় তাহলে সে একজন সৎ ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ী হবে। সে যদি মজুর হয় তাহলে সৎ ও পরিশ্রমী মজুর হবে। মোটকথা প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন আহমদী অন্যদের তুলনায় ব্যক্তিক্রমী প্রতিভাত হবে। হুযূর বলেন, আপনারা সত্যবাদী মুসলমান ও দেশের একজন সুনাগরিকে পরিণত হোন। সৎ মুসলমান অর্থাৎ আহমদীই সত্যিকারের মুসলিম। সৎ আহমদী মুসলমানে পরিণত হোন। শেষে হুযূর দোয়া করান, আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে মঙ্গলের সাথে ঘরে পৌছিয়ে দিন।

হুযূর আনোয়ার ইজতেমায়ী দোয়ার সাথে এ দিন ব্যাপী সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হুযূর আনোয়ারের জলসায় বক্তৃতা দানের সময়ে Kampore গ্রামেরর একজন বুযুর্গ লাগাতার কাঁদতে থাকেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন, আমি অনেক পাকিস্তানী দেখেছি কিন্তু এ ব্যক্তি পাকিস্তানী নন, ইনি তো খোদার মানুষ। একথা বলতে থাকেন আর কাঁদতে থাকেন।

প্যান্ডেলের বাইরের এলাকায় রৌদ্র ও গরম ছিলো। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও প্যান্ডেলের শেষ অংশের লোক উঠে মঞ্চের ডানে ও বামে এসে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে যান। যখন ব্যবস্থাপকরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, প্যান্ডেলের নীচে ছায়ায় গিয়ে বসুন তখন তারা বলেন, আমাদেরকে কাছ থেকে হুযূরকে দেখতে দিন। আমরা রৌদ্র সহ্য করতে পারবো।

৫-৩০ মিঃ এর সময় হুযূর আনোয়ারের সম্মানে একটি বৈকালিক টি-পার্টির আয়োজন করা হয়েছিলো। যারা হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন এতে তাদেরকে দাওয়াত করা হয়েছিলো। এছাড়াও শহরের চীফ ইমাম ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মানীত লোকদেরকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো।

মেয়র সাহেব হুযূর আনোয়ারের সম্মুখে এলাকার রীতি অনুযায়ী পুরুষের ব্যাগ ও তীর ধনুক উপস্থাপন করেন।

এ কর্মসূচী শেষে হুযুর আনোয়ার সন্ধ্যা ৬টার সময় Kaya থেকে ওগাড়ুগুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। রওয়ানা দেয়ার পূর্বে হুযূরের সাথে সম্ভ্রান্ত মেহমানগণ ছবি তোলেন। Kaya থেকে ওগাড়ুগুর দূরত্ব ১০০ কি. মি.। ৭-৩০ মিঃ হুযূর আনোয়ার ওগাড়ুগু পৌছেন। ৮টার সময় হুযূর ওগাড়ুগুর মসজিদুল মাহ্দীতে নামায মাগরিব ও ঈশা জমা করে পড়ান। এরপর হুযূর আনোয়ার তাঁর অবস্থানস্থল Hotel Sofetel-এ গমন করেন।

১লা এপ্রিল, ২০০৪ রোজ বৃহস্পতিবার

হুযূর আনোয়ার মসজিদুল মাহ্দী (ওগাড়ুগু)-তে ফজরের নামায পড়ান। এরপরে ডাক দেখেন। নামায যুহর ও আসরের জন্যেও হুযূর তাঁর হোটেল থেকে মসজিদুল মাহ্দীতে আসেন।

বেলা ২-৩৫ মিঃ ওগাড়ুগু থেকে Bobo Dioulasso-এর পথে রওয়ানা দেন। এ দু'টি স্থানের দূরত্ব ৩.৬৫ কি. মি.। রাস্তা পাকা। সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ারের কাফেলা Bobo Dioulasso পৌছে।

Bobo Dioulasso-তে ইসলামিক রেডিও আহমদীয়া রয়েছে। এর রেঞ্জ (এলাকা) হলো ৫০ কি. মি.। নিজেদের গন্তব্যের দিকে যতই আগাচ্ছিলো ততই রেডিও রেঞ্জের মাঝে প্রবেশ করছিলো আর ড্রাইভাররা রেডিও অন করতে থাকে। তখন এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর কণ্ঠে কুরআন করীমের তেলাওয়াত হচ্ছিলো। জুলা ভাষার সাথে সাথে এর অনুবাদ করা হচ্ছিলো। এরপরে কোরাস 'সায়্যিদী, মুশফিকী, মুরশিদী ...' প্রচারিত হয়। মাগরিবের নামাযের সময় হলে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের কণ্ঠে আযান প্রচারিত হয়। ইতোমধ্যে কাফেলা গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়।

Bobo Dioulasso-তে Ran Hotel-এ হুযূর আনোয়ার ও কাফেলার সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে জামাতের মুবাল্লিগ মোকাররম শাকিল আহমদ সাহেব, সদর জামাত, Zono Salif সাহেব, মজলিস নসুরুৎ জাহাঁ এর ডাক্তার মোকাররম যুলফিকার সাহেব, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, কায়েদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতের অন্যান্য কর্মকর্তা হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানান।

Bobo Dioulasso বুরকিনা ফাঁসূ এর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। Economic Estate। এ শহরে জামাতের দু'টি মসজিদ আছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে জামাত ছড়িয়ে আছে। Bobo Dioulasso-রিজিওনে তিনের অধিক জামাত রয়েছে। এসব জামাত থেকে তিন হাজারেরও অধিক নর-নারী হুযূর আনোয়ারকে খোশ আমদেদ জানাবার জন্যে জামাতে কেন্দ্রে একত্র হয়েছিলেন।

৭-৩০ মিঃ-এর সময় হুযূর মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের জন্যে Boba Dioulasso-এর আহমদী মসজিদে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত জামাতের বন্ধুগণ প্রেমপূর্ণ ধ্বনির মাধ্যমে হাত নেড়ে নেড়ে হুযূরকে স্বাগত জানান। প্রত্যেকের মুখ হাসি-খুশিতে ভরপুর ছিলো। সবাই অশেষ খুশীতে পরিপূর্ণ ছিলেন। হুযূর আনোয়ারের সুদর্শন মুখ দেখতে দেখতে নারায়ে তকবীর উচ্চকিত করছিলেন। বালিকারা কোরাস গেয়ে গেয়ে স্বাগত জানাচ্ছিলো। খুবই ঈমানবর্ধক ও মনকাড়া দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো। হুযূর আনোয়ার হাত নেড়ে নেড়ে ধ্বনির জবাব দিচ্ছিলেন। নামাযের পরে হুযূর আনোয়ার তাঁর অবস্থানস্থল Ran Hotel-এ গমন করেন।

২রা এপ্রিল, ২০০৪ রোজ শুক্রবার

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) Bobo Dioulasso-আহমদীয়া মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়ান। সকাল ৯টা বাজে ডাক দেখেন।

দুপুর ১টা বাজে জুমুআর নামায পড়ার জন্যে হুযূর Bobo Dioulasso-আহমদীয়া মসজিদে গমন করেন। হুযূর আনোয়ারের খুতবা টেলিফোনের মাধ্যমে এমটিএ সারা বিশ্বে Live সম্প্রচার করে। এভাবে আহমদীয়া ইসলামিক রেডিও Boba Dioulasso হুযূর আনোয়ারের জুমুআর খুতবা সরাসরি প্রচার করে। জুমুআর নামাযের সাথে আসরের নামাযও জমা করে পড়া হয়। পরে হুযূর আনোয়ার নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে আসেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় হুযূর আনোয়ার আহমদীয়া মুসলিম হাসপাতাল Bobo Dioulasso পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে নির্দেশাদি দান করেন। যখন হুযূর আনোয়ার হাসপাতালে পৌছেন তখন মোকাররম ডাক্তার যুলফিকার সাহেব তাঁর স্টাফকে নিয়ে হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানান এবং পরিচয় করিয়ে দেন। হুযূর আনোয়ার সকলকে মুসাফাহার সুযোগ দেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন শেষ করে হুযূর আনোয়ার Bobo Dioulasso ইসলামিক আহমদীয়া রেডিও স্টেশন পরিদর্শনে যান। এ রেডিও স্টেশন বুরকিনা ফাঁসূর ৫০ মিঃ-এর অধিক সময় প্রচারিত হয়। এভাবে দশ লাখের অধিক লোকের নিকট এ রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে আহমদীয়তের বাণী পৌছে থাকে। এ রেডিও সকলের হৃদয়গ্রাহী ও গ্রহণীয়। এ পরিদর্শনের সময় হুযূর আনোয়ার ব্যবস্থাপকদের নিকট বিস্তারিত জানতে চান। আর ব্যবস্থাপকরা হুযূর আনোয়ারের নিকট তাঁর কোন Live প্রোগ্রাম দেয়ার জন্যে আবেদন করেন। হুযূর আনোয়ার নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেন এবং তা Live প্রচার করা হয়।

"রেডিও ইসলামিক আহমদীয়ার শ্রোতাদেরকে আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে তাঁর সুরক্ষার নিচে রাখুন"।

রেডিও স্টেশন পরিদর্শনের পর হুযূর বাইরে বের হয়ে আসলে Koudogou রিজিওনের Tyniema নামক এক গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু, যার নাম মিষ্টার আওরিস হুযূর আনোয়ারের খেদমতে একটি লাঠি ও নিজের একমাত্র পুত্রকে উপস্থাপন করেন। ছেলের বয়স ২৫ বছর। পিতার আকাঙ্ক্ষা তার ছেলে যেন জামাতের খেদমত করে। এ ব্যক্তির মাধ্যমে Tyniema ও Naba Dougou - তে আহমদীয়তের সূচনা হয় এবং জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সাহেবকে নিজের বুযুর্গীর কারণে তাঁর এলাকায় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

৬-৩০ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার Bobo Dioulasso মসজিদে মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে পড়ান এবং পরে নিজ অবস্থানস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাত্র ৮টার সময় Bobo Dioulasso জামাতের পক্ষ থেকে হুযূর আনোয়ারের সম্মানে নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে শহরের আমীরগণ ও সম্মানিত মেহমানরা অংশ গ্রহণ করেন। তাদের মাঝে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য ঃ

হাই কমিশনস্, আর্ক বিশপ, মিলিটারীর রিজিওনাল কমান্ডার, রিজিওনাল এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর পুলিশ, একজন সিনিয়র জজ, রিজিওনাল ডাইরেক্টর কাষ্টমস্ এবং গণসংযোগ অফিসার।

নৈশ ভোজের পর হুযূর মেহমানদের নিকট চলে যান। তাদের সাথে পরিচিত হন এবং তাদের সাথে মোসাফাহা করেন। দোয়ার সাথে ৯টার সময় এ প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়। (চলবে)

(১৬-২২ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখের আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে)।

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সতর্ককারীর আহ্বানে সাড়া না দিলে শাস্তি অনিবার্য

বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ঐশী নেতৃত্ব এবং আনুগত্যশীল ইলাহী জামাতের কোন বিকল্প নেই

মহান আল্লাহ্আআলার অনুপম সৃষ্টি মানুষ। এই বিশ্বে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য এবং তার নির্দেশিত পথে চলার জন্যে সৃজন করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সুশৃঙ্খলভাবে আশরাফুল মখলুকাতকে প্রগতির পথে তাকওয়াপরায়ণ হয়ে চলতে হয়। মানুষ বলগাহীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। তাকে সৃষ্টিকর্তার ঐশী বিধি-বিধানের আলোকে জীবন নির্বাহ করতে হয়। সুসভ্য মানুষের আদি পিতা নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরীয়তদাতা নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যত নবী রসূল আবির্ভূত হয়েছেন তাদের সবাইকে (কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করে) গ্রহণ-বরণ করে নিতে হবে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (সঃ)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে ধর্মের পূর্ণতা ঘটেছে। কুরআনী শরীয়ত গ্রন্থে পূর্ববর্তী নবী রসূলের অনুপম শিক্ষাবলী এবং ঐশীবাণী ধারার সমাহার ঘটেছে। এরই উৎস ধারা থেকে উৎসারিত একটি মাত্র মানবকল্যাণপ্রদ ধর্মকেই পালনীয় সত্য ধর্ম হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। একই সত্য এবং স্রষ্টার ধর্ম পৃথক পৃথক হতে পারে না। কাজেই মতবিরোধ ও মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে সর্ব মানবমন্ডলীকে একই মোহনায় এসে মিলিত হতে হবে। ইসলামের নবী (সঃ)-এর তিরোধানের পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। ত্রিশ বছর এই খিলাফতের ধারা বিদ্যমান থাকে। হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) মু'মিনদের ভোটে ঐশী ইঙ্গিতে ও অনুগ্রহে নির্বাচিত হয়ে ইলাহী জামাতে নেতৃত্বের ধারা বহাল রাখেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রিশ বছরের মধ্যে কর্তিত হয়ে যায়। তারপর মুজাদ্দেদিয়তের (ধর্মসংস্কারক) ধারার সূত্রপাত হয়। আবূ দাউদ হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী শতাব্দীর শিরভাগে মোজাদ্দিদ আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত সত্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করেন এবং মুসলিম জাহানকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। ঐশী নেতৃত্বের ধারাবাহিক শৃঙ্খলে ইসলামের নবীর (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন করার কথা রয়েছে। এখন পঞ্চদশ শতাব্দী পার হয়ে ২৫ বছর চলছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ (আঃ) কোথায়? নির্ধারিত সময়ে মাহ্দী ও মসীহ্ (আঃ) আবির্ভূত হলে তাকে তাকে মান্য করা প্রয়োজন নয় কী? প্রগতিশীল একটি জামাত সর্বদা সচল, সক্রীয় ও ক্রিয়াশীল রয়েছে। ঐশী নিযাম বা ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণে চলছে। কাজেই মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ধ্বংস ও বিপর্যয় ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে।

উগ্র মৌলবাদ ও ধর্মীয় রাজনীতিক সন্ত্রাসবাদের অপতৎপরতা ও মানবতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ সন্ত্রাসবাদের দানবীয় কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। অধঃপতিত নৈতিক অবক্ষয়গ্রস্থ বিপথগামী মানুষের নাশকতা কাজের ফলে সুসভ্য মানব সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। হিংস্র পশুতুল্য মানুষের ভয়ে অনেকেই শঙ্কিত। বিপথগামী মানুষকে ধ্বংস ও পতন থেকে বাঁচতে হলে স্রষ্টা নির্দেশিত পথে চলতে হবে এবং ঐশী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় ঐশী শাস্তি থেকে কেউই রেহাই পাবে না। বন্যা, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে এবং বাঁচার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে আকুতি জানাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাক থেকে বাঁচতে হলে ঐশী সতর্ককারীর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দেয়া খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ্ বলেন, "ওয়ামাকুন্না মুয়াজ্জেবিনা হাত্তানাবাছা রাসূলা" অর্থাৎ এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনো আযাব দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই (সূরা বনী ইসরাঈল ১৬ আয়াত)। বলা হয়েছে, "এবং যখন আমরা কোন জনপথকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা স্রষ্টার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দেই-কিন্তু তাতে তারা দুষ্কর্ম করে। তখন এটার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমরা এটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেই" (১৭ঃ১৭)। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে, "যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে।' এবং যে বিপথগামি হয় এবং সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। (১৭ঃ১৬)।

বর্তমান যুগে পৃথিবী একের পর এক পুনঃ পুনঃ নজীরবিহীন ভয়াবহ এবং তুলনাহীন প্লেগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, বন্যা, টর্নেডো বিভীষিকা ও অন্যান্য দৈব-দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে এবং মানব জীবনকে তিক্ততায় দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই সকল চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে পতিত হবার পরে আল্লাহ্তাআলা নিশ্চয়ই ঐশী নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় নির্ধারিত সময়ে কোন না কোন সতর্ককারী মহামানব প্রেরণ করেছেন। কোন দেশ-মহাদেশই আজ নিরাপদ নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কবলে পড়ে বড় বড় শহর ও জনপথগুলো ধ্বংসযজ্ঞে নিপতিত হয়েছে ও হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাককে অনেকে ঐশী আযাব-গযব বলে আখ্যায়িত করেছে। ঐশী আযাব-গযবে নিপতিত হয়ে অনেক জনপদ জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। ভূমিকম্প ও টর্নেডোর তান্ডবের এমন দৃশ্য অনেকেই অবলোকন করেছেন। নূহ ও লূত (আঃ)-এর যুগের ছবি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ঐশী শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে ইসলামী পরিমন্ডলে ইলাহী জামাতে সম্পৃক্ত হয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশিত পথে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনী করে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে হবে। আর এতেই প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্মীয় অঙ্গনে ঐশী নেতৃত্ব এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে যদি মানুষ পরিচালিত হয় তাহলেই বিশ্বে শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে নদী-মাতৃক দেশ বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দৈনিক ইনকিলাব লিখেছেঃ "সারাদেশ আজ ভাসছে বন্যার অনাকাঙ্ক্ষিত পানিতে। প্রায় সবক'টি জেলায়ই প্লাবিত হয়ে গেছে বন্যায়। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষ ও গবাদি পশু। শুকনো মাটির অভাবে লাশ কবর দেয়ার জায়গাও নেই কোথাও কোথাও। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা পৌঁছে গেছে চরমে। এতে করে প্রতিদিন কিছু কিছু মানুষের মৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে" (দৈনিক ইনকিলাবঃ ২৬ জুলাই, ২০০৪)।

লেখক হায়াত মাহমুদ জাকির মনে করেন, এ বন্যা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে বন্যা হওয়ার তথ্য ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের ঐতিহাসিক মহাপ্লাবনের কথা কুরআন করীমের একাধিক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। লেখক জাকির এর মতে, হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির নাফরমানির ফল হিসাবে আল্লাহ্তাআলা শাস্তিস্বরূপ বন্যার পানিতে তাদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন (সূরা হুদ ঃ ৩৯, ৪০ দ্রঃ)।

লেখক বন্যাকে খোদায়ী গযব বলে আখ্যায়িত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তার মতে, 'অনেকে বন্যা নামক খোদায়ী গযবকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করে এবং এর মোকাবিলার চেষ্টা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এ বন্যা আমাদের ভবিষ্যত জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ' (ঐ ২৬/৭/০৪) ঈমান আনার পরই কেবল পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সতর্ককারীর আগমনের সঙ্গে খোদায়ী গযব ওতপ্রোতভাবে বিজরিত রয়েছে। আল্লাহ্তাআলার তরফ থেকে প্রেরিত কোনো মহামানবকে অস্বীকার করার ফল হিসেবে শাস্তিস্বরূপ আকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক অবাধ্য জাতির উপর নেমে আসতে পারে। আল্লাহ্তাআলা কোনো অবাধ্য জাতির নাফরমানির কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করে তাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে পারেন। কেননা, আমাদের জীবন-মরণের নিয়ন্ত্রণ যেমন আল্লাহ্র হাতে, তেমনি বন্যাসহ যে কোন অনিষ্টকর বিষয়ের নিয়ন্ত্রণও তাঁরই হাতে। যেসব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্র হাতে থাকে তা মোকাবিলা করার সাধ্য আছে কার? ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণে তওবা ও মুনাজাতের গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্তাআলার শক্তির প্রতিপক্ষে অবস্থান না করে সমাগত সত্যকে মেনে নিয়ে সতর্ককারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্র প্রতি বিনম্রতা, নিজের অপরাধ, ত্রুটি ও নাফরমানি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে বাঁচতে ইহজাগতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে খোদাতাআলার প্রতি ধাবমান হওয়াও অপরিহার্য (ঐ, ১৬/৭/০৪ইং দ্রঃ)।

এই যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ঐশী সতর্ককারী হিসাবে মানবমন্ডলীকে ইসলাম ধর্মের মূলধারায় সম্পৃক্ত হয়ে পরিশ্রুত ও পরিশুদ্ধ হয়ে (স্রষ্টা নির্দেশিত পথে) চলার আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত ও পরিত্রাণকর্তা হিসাবে মেনে নেয়ার আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (সঃ) বলেছেন, "যখন তোমরা তাকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত করো, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র খলীফা আল্-মাহ্দী (সুনানে ইবনে মাজা-বাবু খুরুজুল মাহ্দী)। বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইমাম মাহ্দীকে পাবে, তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌছে দিবে" (কনযু উম্মাল)। "প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে মাহ্দীর সাহায্য করা অর্থাৎ বলেছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহ্দী)"। ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আহমদীয়া আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেউ নির্ধারিত সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) হওয়ায় দাবি করেননি। আখেরী জামানায় আগমনকারী মহামানব কেবল একজন হবেন। সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীদের কাছে সত্য দাবিকারকের এই বিষয়টি বোধগম্য না-ও হতে পারে। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 'লাল মাহ্দীউ ইল্লা ইসাবনে মারইয়ামা' অর্থাৎ মাহ্দী ও মসীহ্ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নির্ধারিত সময়ে আগমনকারী ঐশী সতর্ককারীকে সাদরে গ্রহণ-বরণ করে না নেয়া হলে খোদাতাআলার রুদ্ররোষ থেকে বাঁচা খুবই কঠিন হবে। মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরই আশীষমন্ডিত ও অনুগত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতে আবশ্যই বয়আত গ্রহণ করতে হবে।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হওয়ায় দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, শুধু ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী (বন্যা, প্লাবন, ভূমিকম্প, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস) প্রকাশিত হবে। কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটা এজন্য যে, মানব জাতি আপন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে এবং মন প্রাণ ও সার্বিক শক্তি দিয়ে কেবল পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হয়েছে। যদি আমি না আসতাম তবে এসব বিপদরাশি আসতে বিলম্ব ঘটত। খোদার ক্রোধ বহুদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল। আমার আগমনের সঙ্গে তা প্রকাশ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, সাবধানকারী প্রেরণ না করে আমি কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না। অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকবে। বিপদ উপস্থিত হবার পূর্বেই যারা ভীত হয় তাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। তোমরা কী মনে করছ যে, এ সকল আযাব হতে তোমরা নিরাপদে বেঁচে থাকবে? তোমরা কী স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? কখনো নয়? মানুষের চেষ্টা সে দিন অচল হবে।... আমি দেখছি হয়ত তোমরা তা হতেও গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হবে"। বলা হয়েছে, "হে ইউরোপ! তুমি নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখেছি এবং জনপথগুলোকে জনমানবশূন্য দেখতে পাচ্ছি। সেই একমেদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করে গিয়েছেন। তখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক। ঐ সময় দূরে নয়"। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আরও বলেন, "আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী'। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর, অনুতাপ কর; তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়, কীট। তাঁকে যে ভয় করেনা সে জীবিত নয় মৃত" (হাকীকাতুল ওহী, ২৫৬-২৫৭ পৃঃ ১৯০৬ ইং)।

বিশ্বব্যাপী সংঘটিত চলমান ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, অব্যাহত গতিতে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পসমূহ, বন্যা, প্লাবন এবং সন্ত্রাসবাদের দ্বারা নাশকতামূলক কাজ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ দাঙ্গা ইত্যাদি প্রাচ্য ও প্রতিচ্যবাসীদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে' যা স্মরণাতীত কালের চেয়ে নজিরবিহীন ও ভয়ংকর। এ যুগের দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, গবেষক ও ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বর্তমান যামানায় যেসব নৈসর্গিক প্রলয়কান্ড ঘটেছে বিগত সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসেও এত অধিক সংখ্যক ঐশী আযাব গযব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে কিনা সন্দেহ।(সীরাতে সুলতানুল কলম গ্রন্থ পৃঃ ১৭৫ দ্রঃ)। তাই কাল বিলম্ব না করে আখেরী যামানায় আগমনকারী মাহ্দী ও মসীহ্ (আঃ)-কে মেনে নিয়ে বিশ্বময় ইসলাম প্রচার অভিযানে শামিল হওয়া দরকার।

- আমীর মাহমুদ ভূইয়া

ওয়াকফে জাদীদ তালীম-তরবিয়তের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৭৭টি দেশে খাঁটি ইসলাম প্রচারকল্পে নিয়োজিত আছে হাজার হাজার মুজাহেদীন। এদের কেউ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছেন আর কেউ নিজ সময় উৎসর্গ করেছেন ইসলামের সেবার জন্য। কারো প্রচেষ্টাই খাটো করে দেখার মতো নয়। সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খাঁটি ইসলামকে মানুষের দ্বারে দ্বারে।

ইসলাম প্রচারের এ কাজকে বেগবান করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি (আঃ) আহমদীয়া জামাতের বন্ধুদেরকে ইসলামের সেবার জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করার তাগিদ প্রদান করেছেন। তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ

'আমি আমার জামাতকে উপদেশ দেয়া আর এ কথা তাদের নিকট পৌছে দেয়া আমার কর্তব্য মনে করি। ভবিষ্যতে এটা শোনা বা না শোনার অধিকার প্রত্যেকের থাকবে। কেউ যদি মুক্তি চায় এবং পবিত্র জীবন ও চিরস্থায়ী জীবনের অন্বেষণকারী হতে চায় তবে সে যেন আল্লাহ্‌র খাতিরে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে এবং প্রত্যেকেই এ প্রচেষ্টা ও চিন্তায় লেগে যায়। যেন সে এ দরজা ও মর্যাদা লাভ করে বলতে পারে যে, আমার জীবন, আমার কুরবানী, আমার নামায সব আল্লাহ্‌র জন্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতো তার আত্মাও বলে উঠবে- 'আসলামতু লি রাব্বিল আলামীন' (মালফূযাত ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আহ্‌বানে সাড়া দিয়ে সেকালের নিষ্ঠাবান সাহাবীগণ নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন তাঁর (আঃ) খেদমতে। আর সমস্ত খেদমত নীরবে করেছেন ইসলামের খাতিরে, আরো নিবেদন জানিয়েছেন বেশি বেশি নিজদেরকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত রাখার জন্য। উদাহরণ হিসেবে এখানে আলহাজ্জ হযরত মওলানা হেকিম নুরুদ্দীন (রাযিঃ) লিখিত একটি পত্র যা তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট পেশ করেছিলেন তা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

'আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আলী জনাব! আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন সর্বদা হুযূর সমীপে হাজির থাকি এবং ইমামুয্‌যামান হতে সেই উদ্দেশ্য হাসিল করি যে উদ্দেশ্যে তাঁকে সংস্কারক করা হয়েছে। অনুমতি হলে চাকুরী ইস্তেফা দিয়ে দিবা-রাত্রি হুযূরের মহান খেদমতে পড়ে থাকবো। কিংবা আজ্ঞা হলে এ চাকুরী ত্যাগ করত দুনিয়া পর্যটন করে লোকদেরকে সত্যধর্মের দিকে আহ্বান করব এবং এ পথেই প্রাণ দেব। আমি আপনার জন্য কুরবান। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর মুরশেদ! আমি পূর্ণ সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ধর্ম প্রচারে ব্যয়িত হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। বারাহীনের খরিদ্দারগণ কিতাবের মুদ্রণ কাজ স্থগিত থাকার কারণে অস্থির হয়ে থাকলে আমাকে এ নগণ্য খেদমত করবার অনুমতি দিন যেন আমি নিজ হাতে তাদের দেয়া সমস্ত মূল্য ফিরত দেই।

হযরত পীর মোরশেদ! এ অযোগ্য লজ্জাবনত অধম আরো নিবেদন জানাচ্ছে যে, মঞ্জুর হলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে। আমার ইচ্ছা, বারাহীনের ছাপা খরচ সবই আমার উপর ন্যস্ত করা হোক এবং যা কিছু মূল্যস্বরূপ আদায় হয় তা আপনার প্রয়োজনে খরচ হোক। আপনার সাথে আমার ফারুকী সম্বন্ধ এবং আমি সব কিছু এ পথে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। দোয়া করবেন আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকের মৃত্যু হয়' (ফতেহ্ ইসলাম পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫০-৫১)।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন কিরূপ ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে নিজেকে পেশ করেছেন ধর্মের সেবার জন্যে। আমাদের প্রত্যেকেরই এরূপ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

শুধুমাত্র এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন অল্প সংখ্যক লোকের প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি (আঃ) জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করেছিলেন আরো বেশি বেশি মুজাহেদীন সৃষ্টির লক্ষ্যে। তিনি (আঃ) উল্লেখ করেন, "আমাদের এ জামাতের অন্তত একশ' এমন জ্ঞানী ও আদর্শ ব্যক্তি থাকা আবশ্যক। এ সিলসিলাহ্ এবং এ দাবী সম্বন্ধে খোদাতাআলা যেসব নিদর্শন এবং শক্তিশালী অকাট্য যুক্তি প্রমাণ প্রকাশ করেছেন, তৎসংক্রান্ত পুরাপুরি জ্ঞান তাদের থাকে। বিরুদ্ধবাদীগণের নিকট প্রত্যেক বৈঠকে উত্তম, পরিপূর্ণ যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে এবং বিরুদ্ধবাদীগণের মিথ্যা অভিযোগসমূহের জবাব দিতে পারে এবং খ্রীষ্টান ও আর্যগণের প্রকাশিত ধোঁকাসমূহ হতে প্রত্যেক সত্যান্বেষীকে মুক্ত করতে পারে আর ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব পুরাপুরিভাবে বুঝাতে পারে। সুতরাং এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, আমাদের জামাতের সমুদয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিবেচনাশীল ব্যক্তিগণকে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে, তারা ২৩ ডিসেম্বর, ১৯০১ সন পর্যন্ত কিতাবসমূহ পাঠপূর্বক এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং আগামী ডিসেম্বরের বন্ধের সময় কাদিয়ানে উপস্থিত হয়ে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহে পরীক্ষা দিন। এখানে এ উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বন্ধে একটি অধিবেশন হবে এবং উল্লিখিত গবেষণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এ সকল প্রশ্নের ফলে যে সকল জামাত পাশ করবেন তাঁদেরকে এ সব খেদমতের জন্য মনোনীত করা হবে। তাদেরকে কোন উপযুক্ত স্থানে সত্যের আহ্বানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। এ প্রকারে বছরে বছরে এ জনসমাগম ইনশাআল্লাহ্ এ উদ্দেশ্য নিয়ে কাদিয়ানে হতে থাকবে যে পর্যন্ত না এ প্রকার মুবাহেসাকারীগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রস্তুত হয়" (ইশতাহার, মুফিদুল আখ্‌ইয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০১, তবলীগে রেসালাত, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২)।

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রস্তুত হয়ে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারে সদা নিয়োজিত রয়েছেন।

তাঁর (আঃ) এ মহান এ মহান লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযিঃ) ১৯৩৪ সালের ২৩ নভেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীক করলেন আর তা হলো 'তাহ্‌রীক এ জাদীদ'।

এ তাহ্‌রীক এর মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন

বিরুদ্ধবাদী আহারারী আন্দোলন এর যথাপোযুক্ত জবাব দেয়া ও সারা বিশ্বব্যাপী আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলাম প্রচার ও প্রসারিত করা। অতি অল্প সময়ে দলে দলে এ তাহ্‌রীকে অংশ গ্রহণ করে জীবন উৎসর্গ করতে থাকেন। এরই বর্তমান রূপ আমরা দেখি সারা বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত মুবাল্লেগবাহিনী। আজ তাঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে 'তাহ্‌রীকে জাদীদ' এর মাধ্যমে আহ্‌মদীয়ত প্রায় ১৭৭টি দেশে ছড়িয়ে গেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।

অপর দিকে আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাযিঃ) বিচক্ষণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন বহির্বিশ্বে আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ তালীম-তরবিয়তের বিশেষ প্রয়োজন। তাই তিনি (রাযিঃ) ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সালে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক জগতের সামনে পেশ করলেন আর তা হলো ওয়াকফে জাদীদ। প্রাথমিকভাবে এ তাহ্‌রীক-এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সমগ্র উপ মহাদেশের জামাতগুলির স্থানীয়ভাবে সঠিক তালীম ও তরবিয়ত প্রদান করা। পরবর্তীতে এর সীমা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে।

জন্মলগ্নে এ তাহ্‌রীক 'ওয়াকফে জাদীদ' এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাযিঃ) বলেছিলেন,-এ তাহ্‌রীক জারী রাখার জন্য যদি আমার গায়ের কাপড়-চোপড়ও বিক্রি করতে হয় তা করতে দ্বিধা করবো না। আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে জামা-কাপড় খলীফা সাহেবের বিক্রি করতে হয়নি খলীফার এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন আহমদী বন্ধুগণ তা তো আজও আমরা ওয়াকফে জাদীদকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টায়রত এক বাহিনী দেখতে পাই যাদের বর্তমান রূপ মোয়াল্লেম বাহিনী।

তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে খোদাতাআলার অশেষ ফযলে দেশের অভ্যন্তরে তালীম-তরবিয়তের কাজে প্রসারতা লাভ করে চলেছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসহ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্নত মোতাবেক ইসলামী কৃষ্টি-সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় এ বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে ও নও মোবায়েনদের ক্ষেত্রে এ মাত্রা আরো বেশি বৃদ্ধি লাভ করেছে।

গত ৩রা জানুয়ারী, ২০০৩ তারিখে হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'ওয়াকফে জাদীদ' এর ৪৬তম নববর্ষের ঘোষণার প্রাক্কালে বলেন, "এবার আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করছি। ওয়াকফে জাদীদের এ তাহ্‌রীক আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ইং তারিখে ঘোষণা করেছিলেন। আহমদী শিশু সন্তানদের অন্তরে মালী কুরবানীর উৎসাহ বাল্যকাল থেকেই সৃষ্টি করার লক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৬ইং সনে 'ওয়াকফে জাদীদ' দফতর আতফাল খুলেছিলেন। প্রথম যুগে এ তাহ্‌রীক কেবল হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর বিশ্বব্যাপী জামাতের অসাধারণ অগ্রগতি ও বিস্তারকে সামনে রেখে আমি ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ইং তারিখে এ তাহরীককে সারা পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আজ আল্লাহ্‌র ফযলে ১১১টি দেশ আহমদীয়তের এ মহান তাহ্‌রীকের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শামেল হয়েছে। এ খাতে চাঁদা দানে শিশুরাও এখাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। হুযূর (রাহেঃ) হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) নও মোবাঈনদের থেকে তাদের ইচ্ছাকৃত এখাতে চাঁদা দানে উৎসাহ প্রদান করতে বলে গেছেন।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন এ তাহ্‌রীক (ওয়াকফে জাদীদ) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? কেনই বা এ তাহ্‌রীক এত গুরুত্বপূর্ণ? ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সালে এতাহ্‌রীক 'ওয়াকফে জাদীদ' প্রতিষ্ঠার পিছনে আল মুসলেহ মাওউদ' (রাযিঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই;

* এক বিরাট বাহিনী যারা নিজেদের জীবন ওয়াকফ্ (উৎসর্গ) করে ইসলামের সেবার জন্য মন-মানসিকতা তৈরী করবে। দীনী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত পাকিস্তান ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জামাতগুলোতে শিশুদের মাঝে ও নও মোবাঈনদের মাঝে ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

* এমন একটি 'ওয়াকফে জাদীদ' মোয়াল্লেম বাহিনী গঠন করা যাদের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে তালীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে জামাতকে সমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যেন বিরোদ্ধবাদীদের অপপ্রচারে জামাতের সদস্যরা বিভ্রান্ত না হয়।

* আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলামের মৌলিক বিষয় যেমন, নামায, কলেমা, রোযা, যাকাত, হজ্জ, কুরআন শিক্ষা, আদব-কায়দা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে মোয়াল্লেমগণ সদা স্থানীয় জামাতের সদস্যদের মাঝে তা'লীম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা চালু রাখবে।

* শিথিল আহমদীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদেরকে সজাগ করবে, শিশুদের মাঝে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের জন্য আর্থিক কুরবানীর শিক্ষা প্রদান করবে।

* বিশেষ করে নও মোবাঈনদের আহমদীয়তের শিক্ষা তথা সত্যিকার ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে যেন তারা অতি যত্ন সহকারে ইসলামের সেবায় আর্থিক কুরবানীতে শরীক হয়।

* প্রত্যেক গ্রাম্য জামাতে যেন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সেই জামাতের যাবতীয় বিষয়ে ইসলামের কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিদৃষ্ট হয় সে লক্ষ্যে তালীম ও তরবিয়তী কাজে যত্নবান থাকবে।

* কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে খুঁটি-নাটি সমস্যার সমাধান দিবে বা পরামর্শ প্রদান করবেন।

* স্থানীয় জামাতে নিজস্ব গন্ডীর মাঝে আহমদীয়তের প্রচার বা তবলীগ করবে মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে। প্রয়োজন হলে আরো বেশি জানতে আগ্রহী লোকদিগকে মুবাল্লেগ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দিবে।

মূল কথা একটি স্থানীয় জামাত ও জামাতের সদস্যদেরকে তা'লীম ও তরবীয়তির মাধ্যমে ইসলামের মডেল হিসাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করবে- এ তাহ্‌রীক 'ওয়াকফে জাদীদ'কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের অনেক বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে, যেমন–আহমদী সকল সদস্যদেরকে এখাতে শামেল হতে হবে ও করাতে হবে। এখন ওয়াকফে জাদীদ চাঁদার ওয়াদার কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই। হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) যে যার সামর্থ ও ইচ্ছা মতো এখাতে চাঁদার ওয়াদা করতে পারবে বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন। তবে স্মরণ রাখতে হবে

যে। প্রত্যেকেই যেন শামেল হয়। আর মু'মিনের কদম সামনে চলে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে এটাকে স্মরণ রাখতে হবে। তাই শিশু নও মোবাঈন,আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে এ খাতে শামিল করানোর জন্য আমাদের সকলের কাজ করা উচিত।

'ওয়াকফে জাদীদ' এর বছর জানুয়ারী থেকে শুরু হয় ও ডিসেম্বরে শেষ হয়। বছরের শুরুতেই প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে এ তাহ্‌রীকের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রত্যেকের নিকট থেকে চাঁদার ওয়াদা লিখাতে হয়। ওয়াদা যত কম হোক না কেন কোন শিশু যেন বাদ না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওয়াদা লেখা শেষ হলে সুন্দর করে একটি তালিকা করে নিজেদের জন্য একটি কপি রেখে একটি কপি কেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করতে হয়। স্থানীয় কপিতে লেখা ওয়াদা মোতাবেক চাঁদা আদায়ের জন্য 'আশরা' পালন করে সদস্যদের বুঝানো হয় বিশেষ করে রমযান আসে ও বছরের শেষে এ চাঁদার ওয়াদা অনুযায়ী পরিশোধকারীদের নাম তালিকা করে কেন্দ্রে পাঠাতে হয় হুযূর (আইঃ)-এর সমীপে দোয়ার জন্য। ওয়াকফে জাদীদ এর তাহ্‌রীককে এগিয়ে নিতে ও এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমাদের করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক যেমন;

(১) ওয়াকফে জিন্দেগীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা প্রয়োজন যেন অন্যেরাও তাদের দেখে এমনটি করতে পারে।

(২) প্রত্যেক মহল থেকে ওয়াকফে জিন্দেগী যেন আসে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার।

(৩) প্রতিটি অঙ্গ-সংগঠনের মাধ্যমে ওয়াকফে জিন্দেগী করানোর জন্য জোর তাগিদ দেয়া প্রয়োজন।

(৪) প্রতিটি অভিভাবকের নিজ সন্তানদের ওয়াক্‌ফ করার মন মানসিকতা তৈরী করতে হবে যেন প্রত্যেকের কামনায় থাকে আমার সন্তান ওয়াকফ্ করতে চাই।

(৫) প্রত্যেক ওয়াকফে জিন্দেগীর এমন আচার-আচরণ হওয়া উচিত যেন তার জন্য অন্য ওয়াকফে জিন্দেগীর সম্মান হানি না হয়।

(৬) সর্বোপরি ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করিয়ে এ খাতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

দোয়ার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক-এর উন্নতি কল্পে এগিয়ে এলে জামাতের সার্বিক কল্যাণ সাধন হবে। আল্লাহ্ করুন এ গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীক যেন সফলতার পথ বেয়ে সামনে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়, (আমীন)।

- এনামুল হক রনি
মোয়াল্লেম

সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ২য় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা ২০০৪ অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন যুহর নামাযের পর বিকাল ৩.৩০ মিনিটে রাজশাহী রিজিওনাল কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন পাঠ করেন জনাব তারেক আহমদ (কায়েদ বীরগঞ্জ) বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ (দেহাতি মোয়াল্লেম ভাতগাঁও)। দোয়া করান প্রেসিডেন্ট জগদল জনাব ডাঃ ইসমাঈল হোসেন। আহাদ পাঠ করান রাজশাহী রিজিওনাল কায়েদ সাহেব রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুর রউফ চেয়ারম্যান তা'লীম তরবিয়ত ক্লাস ইজতেমা ২০০৪। নসিহতমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ঃ

* জনাব মিজানুর রহমান, মোয়াল্লেম ভাতগাঁও, * জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম আগমদনগর, * জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, মোয়াল্লেম হেলেঞ্চাকুরী, * জনাব ডাঃ ইসমাইল হোসেন, প্রেসিডেন্ট জগদল (বীরগঞ্জ)।

* জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, জেলা কায়েদ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা। সভাপতি সাহেব রাজশাহী রিজিওনাল কায়েদ মোঃ রফিকুল ইসলাম সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন।

১২ জুন থেকে ১৬ জুন ৫ দিন তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস হয়।

১৭ জুন হতে ১৮ জুন ২ দিন ইজেতমা অনুষ্ঠিত হয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসের বিষয় সমূহের প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় এবং খেলাধূলা হয়।

১৮ জুন বাদ জুমুআ আসরের নামায জমা পড়ে বিকাল-৩.৩০ মিনিটে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় মেহমান মোহতামীম ইশাআত জনাব ডাঃ শরিফুল হাকীম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, চেয়ারম্যান
২য় জেলা তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস
ও ইজতেমা
বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা

পটুয়াখালী জেলা মজলিসের ৪র্থ বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা ২০০৪ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত সফলভাবে বিগত ১১ জুন ২০০৪ ইং তারিখ হতে ১৭ জুন ২০০৪ইং তাং পর্যন্ত বরিশাল পটুয়াখালী জেলা মজলিসের ৪র্থ বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কুকুয়া জামাতের মোয়াল্লেম জনাব নাসের আহমদ আনসারী, কৃষ্ণনগর জামাতের মোয়াল্লেম জনাব ইদ্রিস আহমদ, কৃষ্ণনগর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ মাষ্টার এবং খাকদান জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব লুৎফর রহমান।

তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস শেষে ইজতেমায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রদের মধ্যে মোট ৯২টি পুরস্কার বিতরণ করা।

মোঃ শফিকুল ইসলাম, জেলা কায়েদ
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
বরিশাল-পটুয়াখালী

কৃতী ছাত্রী

সানিয়া আক্তার ২০০৪ এর এস. এস. সি পরীক্ষায় রাজশাহী পি.এন সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে সফলতার সাথে জি.পি এ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে; সে জনাব শহীদ হোসেন খান এবং সাহিদা বেগমের কনিষ্ঠা কন্যা। সে আগামীতে ভাল করার প্রত্যাশায় জামাতের সকলের কাছে খাসভাবে দোয়া- প্রার্থী।

- শফিক আহমদ খান

যুক্তরাজ্যের ৩৮তম (আন্তর্জাতিক) সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে অত্যন্ত শান-শওকত ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গত ৩০, ৩১ শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট '০৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র জামাতে আহমদীয়ার ৩৮তম জলসা সালানা। এমটিএ(MTA)-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে এ জলসা সত্যিকার অর্থেই এক আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

উদ্বোধনী দিনে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম আমীরুল মু'মিনীন, হযরত আকদস মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস্ (আইঃ) জুমুআর নামায পড়ান। এরপর লন্ডন সময় জুপুর ৩.৩০ মিঃ জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য তেলাওয়াতকারী মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। এরপর একটি নযম পরিবেশন করা হয়। হুযূর (আইঃ) তাকওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে জলসার উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। শনিবার ৩১শে আগষ্ট দ্বিতীয় অধিবেশনে সকাল ৯.০০ টায় বিভিন্ন নযম এবং বক্তব্য পরিবেশিত হয়। সকাল ১১.০০ টায় মহিলাদের জলসাগাহ্ (মার্কি) থেকে হুযূর (আইঃ) ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পুরুষের সাথে নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দুপুর ২-৩০ মিনিটে হুযূর বছরব্যাপী জামাতী কর্মকান্ড ও সাফল্যের উপর বিস্তারিত রিপোর্ট দেন। বিভিন্ন জায়গায় জামাতের সমর্থনে প্রকাশিত নিদর্শনসমূহ এবং মোখালেফাতের ঘটনাবলী তুলে ধরেন। রোববার ১লা আগষ্ট '০৪ সকাল ৯.০০ টায় চতুর্থ অধিবেশনে জামাতী বুযূর্গগণ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এদিন দুপুর ১২.০০ টায় আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর নতুন বয়াত করেন তিন লক্ষ চার হাজার নয় শত দশ জন। যুগ খলীফার হাতে হাত রেখে সারা বিশ্বের আহমদীগণ এমটিএ-এর মাধ্যমে একই সাথে বয়আত করার তৌফিক লাভ করে। ১লা আগষ্ট রোববার দুপুর ৩.০০ টায় হুযূর (আইঃ)-এর সভাপতিত্বে জলসার সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মোমেনের বৈশিষ্ট্য ও খোদাভীতির স্বরূপ সম্পর্কেই হুযূর (আইঃ) মূলত তাঁর বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখেন। শেষের দিকে হুযূর (আইঃ) ওসীয়্যতের নেযাম সম্পর্কে কিছু কথা বলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কেন ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছিলেন তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখনী থেকে তুলে ধরেন। অবশেষে হুযূর (আইঃ) তাহ্‌রিক করেন যে, আগামী এক বছরে অন্ততপক্ষে ১৫,০০০ (পনর হাজার) লোককে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল করতে হবে। হুযূর (আইঃ) এ-ও বলেন আমার আন্তরিক চাওয়া এটাই যে, ২০০৮ সালে যখন খেলাফতের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে তখন যেন আমাদের মুসীদের (যারা ওসীয়্যত করেছেন) সংখ্যা চাঁদা দাতার অর্ধেক হয়। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ সমাপ্ত হয়। এরপর স্টেইজের সবার সাথে হুযূর (আইঃ) কিছুক্ষণ দাঁড়ান। এ সময়ে নারায়ে তকবীরের আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছিল। বিশেষভাবে আফ্রিকানরা তাঁদের প্রচলিত সুরে কালেমা তাইয়্যেব পাঠ করছিলো। অতঃপর চারদিকে একই সুর যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল-"**ইন্নি মা'আকা ইয়া মাসরূর**" (অর্থাৎ হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি)। শেষে হুযূর মহিলাদের মার্কিতে যান। মহিলারাও নারায়ে তকবীরের মাধ্যমে হুযূর (আইঃ) কে স্বাগত জানান। তাঁরা হুযূরকে কয়েকটি নযমের কোরাস শোনান। এ জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বার্তাবাহক, বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী, এম.পি., মেয়রগণ বক্তব্য রাখেন এবং ইংল্যান্ড জামাতের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ জলসায় প্রায় ৭৫টি দেশ থেকে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) এর অধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়

শুভ বিবাহ

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ দয়া ও রহমতে গত ৭ই মে শুক্রবার ৪ বকশী বাজার ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে বাদ জুমুআ জনাব **সিবগাতুর রহমান (মুকুল)**, পিতা-মৃতঃ মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম ভূঁইয়া, গ্রাম+পোঃ ক্রোড়া এর বিয়ে **আমাতুল সাদেকা (জয়া)**, পিতা- মোহাম্মদ ওবায়েদ উল্লাহ্, মীর বাড়ি, ছোট দেয়ান পাড়া, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে টাকা ৭৫,০০০/= (পঁচাত্তর হাজার) মাত্র দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী মুরব্বী সিলসিলাহ্ আলীয়া আহমদীয়া। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ও মোকাররম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। জামাতের নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। ১৬ জুন '০৪ রোজ বুধবার রুখসাতানা ও ১৮ই জুন '০৪ রোজ শুক্রবার দাওয়াতে ওয়ালীমা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিয়ে যেন দুই পরিবারের জন্য বরকতময় ও আহমদীয়তের আদর্শকে ধারণকারী পরিবার হিসাবে সাব্যস্ত হয় সেজন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের কাছে বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী।

- দুই পরিবারের সদস্যবৃন্দ

লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'আহমদীয়াতঃ আশা ও শান্তির বার্তা' শীর্ষক সেমিনার

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে ঘাস লাগানোর দৃশ্য

The AHMADI Bulletin 15 August, 2004
(Published for Talim and Tarbiyyat for the members of Ahmadiyya Muslim Jamaat)

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য করা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন ? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এ কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

ধূমপান পরিহার সম্পর্কে

১৮৯২ইং সনে মসীহ্ মওউদ (আঃ) জলন্ধর গিয়েছিলেন। হযরত সাহেব উপর তলায় থাকতেন। কোন চাকরানী হুক্কা রেখে কোন কাজে গিয়েছিল। ঐ হুক্কা পড়ে গিয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল এবং কিছু জিনিস জ্বলে গিয়েছিল। এতে হযরত (আঃ) যারা হুক্কার তামাক খায় বা ধূমপান করে তাদের প্রতি অসন্তোস প্রকাশ করে কিছু কথা বলেছিলেন। এ খবর নিচের তলায় পৌঁছে গেল। সেখানে অনেকেই ধূমপায়ী ছিলেন। তারা যখন জানতে পারলেন যে, হযরত সাহেব হুক্কা সেবীদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তখন তারা হুক্কা ভেঙ্গে ফেললেন। এবং চিরতরে ধুমপান ত্যাগ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে জামাতের সবাই জানতে পারলেন এবং অনেকেই হুক্কা বা ধূমপান পরিত্যাগ করেছিলেন (আসহাবে আহমদ; ১০ম খন্ড; ১৫৭ পৃষ্ঠা)।

হযরত মির্যা আহমদ বেগ সাহেব শাহীওয়াল কর্তৃক বর্ণিত–হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) একবার আমার মামা মির্যা গোলামুল্লাহ্ সাহেবকে বললেন, 'মির্যা সাহেব! বন্ধুদেরকে হুক্কা বর্জনের উপদেশ দিতে থাকুন"। মামা তো নিজেই হুক্কা সেবন করতেন। বললেন, জ্বী হুযূর! বাড়ি এসে দেয়ালে দাঁড় করানো নিজের হুক্কাটা ভেঙ্গে দিলেন। মামীজান ভাবলেন, মামা খুব রাগ হয়েছেন, আজ হুক্কা অনেক বেলা পর্যন্ত রোদে পড়েছিল বলে হয়ত রাগ করে ভেঙ্গেছেন। কিন্তু মামা তো কথা বলছেন না। মামানী জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার কেন রাগ হয়েছেন যে, হুক্কা ভাংছেন? মামা সাহেব খুব নরম সুরে বললেন, হযরত সাহেব বলেছেন, মানুষকে হুক্কা সেবন না করার জন্য বলতে হবে। অতএব, বাধ্য হয়ে প্রথমে নিজে তো হুক্কা পরিত্যাগ করতে হবে। নতুনা মানুষকে কি করে বলব? তারপর মামা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হুক্কা ধরেননি। অন্যদেরকেও হুক্কা সেবনে নিষেধ করতেন।

আজকাল ঐ যুগের হুক্কা সিগারেট আকারে প্রচলিত আছে। সুতরাং যারা সিগারেটের ধূমপান করেন তাদের উচিত এ কাজ না করা। ছোট বয়সে এটা একবার ধরলে ছাড়া কষ্টকর হয়। তাছাড়া সিগারেট কয়েক প্রকার হয়ে গেছে। এতে নেশা-মাদকদ্রব্য শামিল করা হয়েছে। যুবকদের জীবন ধ্বংসের কারণ হতে পারে। দূর্ভাগ্যবশত মুসলিম দেশসমূহেও এসব চালু হয়েছে। সুতরাং আমাদের যুব সমাজকে এর থেকে অবশ্যই রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। (খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) এর খুতবা থেকে)

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকসি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত
Printed and Published by Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat at Ahmadiyya Art Press,
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211